প্রতীচী

The West
2020

শারদীয় দুর্গোৎসব, ১৪২৭

Bengali Association of Greater Atlanta

প্রতীচী

The West
শারদীয়া দুর্গাপুজো ১৪২৭

Editor:
Malabika (Nita) Bose

Co-Editors:
Rabindra Chakraborty
Sajal Chattopadhayay
Soumitra Chattopadhyay

Editorial Board
Anil Chakraberti
Debasree Chatterjee
Parimal Majumder

Type Setting & Layout
Paromita Ghosh
Rina Datta Chakravorty
Satinath Sarkar

Cover Design
Indrajit Chowdhury

সম্পাদক
মালবিকা (নীতা) বোস

সহ-সম্পাদক
রবীন্দ্র চক্রবর্তী
সজল চট্টোপাধ্যায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক মন্ডলী
অনিল চক্রবর্ত্তী
দেবশ্রী চ্যাটার্জী
পরিমল মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস, পরিকল্পনা ও রূপায়ন
পারমিতা ঘোষ
রীণা দত্ত চক্রবর্তী
সতীনাথ সরকার

প্রচ্ছদ
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

Published by

Bengali Association of Greater Atlanta, Inc.
A nonprofit organization under IRS Code 501(c)(3)
PO Box 88541, Atlanta, GA 30356, USA
Serving the community since 1979

Disclaimer

The statements & opinions contained in the advertisements and writings are solely those of the advertisers/authors and do not necessarily reflect those of the editors or the publisher. Images and art used in this magazine has been sourced from the internet and has no commercial value. The appearance of advertisements in this publication is not a warranty, endorsement or approval of the products or services advertised or of their safety. The Editors & the Publisher disclaim responsibility for any injury to persons or property resulting from any ideas or productions referred to in the articles or advertisements.

Contents

Pratichi *The West*: Credits

Editorials 5
BAGA President's Message 9
BAGA Board of Directors 11
BAGA Executive Committee 2020 12
BAGA Extended Committee 2020 13
BAGA Events 2020 14

আমন্ত্রিত

Soumitra Chattopadhyay/ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
বাতিঘর লক্ষ্য করে 18
Srijato / শ্রীজাত
কবিতাগুচ্ছ 19
Samaresh Majumdar/ সমরেশ মজুমদার
নিজের জন্যে কাঁদা 20
Ranjan Bandyopadhyay/ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
অজ্ঞাতবাসের সহবাস 22
Rudra Sankar/ রুদ্র শংকর
পৃথিবী 25
Tridib Chattopadhyay/ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
এসপার ওসপার 26
Mriganka Bhattacharya / মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মারাংবুরু 33
Ahana Biswas / অহনা বিশ্বাস
রূপকথা, মুখোসকথা 41

আমাদের

Asit Baran Saha / অসিত বরণ সাহা
অবনী ভাল নেই 45
Anil Chakraberti / অনিল চক্রবর্তী
করোনা-গৃহবন্দীর পথচাওয়া 46
Gautam Dutta / গৌতম দত্ত
নিভিতে দিও না 50
Kiriti Gupta/কিরীটি গুপ্ত
The Best of Greece 51
Ashok Ganguly/অশোক গাঙ্গুলী
বিপথে 53
Rabindra Chakraborty/রবীন্দ্র চক্রবর্তী
কবিতা 54
Ranen Chatterjee / রণেন চ্যাটার্জী
My Sixth Sense 55
Abir Mullick / আবির মল্লিক
Sally, The Last Opportunity 57
Ranjit Datta / রঞ্জিত দত্ত
বাংলা ভুলি কি করে 60
Pandit Jasraj / পণ্ডিত যশরাজ
An Interview on Pandit Jasraj 62
Sikha Karmakar / শিখা কর্মকার
উৎস 66
Ashit Sengupta / অসিত সেনগুপ্ত
Opinion 67
Debasree Chatterjee / দেবশ্রী চ্যাটার্জী
আমার ডায়েরি থেকে 68
Pritam Bhattacharjee / প্রীতম ভট্টাচার্য
কবিতা 69
Malabika (Nita) Bose/মালবিকা (নীতা) বোস
Fear, Confusion & Rising Awareness of Human Consciousness 70
Partha Mukherjee/পার্থ মুখার্জী
Chandi Story 72
Partha Banerjee / পার্থ ব্যানার্জি
বিদায় ফুটবলের জাদুকর 76
Vimal Nikore/বিমল নিকোর
Homage to an Unsung Heroine of Modern India 77
Indira Bhowal / ইন্দিরা ভাওয়াল
অভিজ্ঞতা 79
Niranjan Talukdar / নিরঞ্জন তালুকদার
শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক সারমর্ম 81

বাঙালিয়ানা

Rina Datta Chakrabarty / রীণা দত্ত চক্রবর্তী
বারো মাসে তেরো পার্বণ 84
Joyshree Chowdhury / জয়শ্রী চৌধুরী
তদস্তু হৃদয়ং মম 88
Pratibha Goel / প্রতিভা গোয়েল
Gamcha : Revival of the Weave 91

Contents

Ananya Bhattacharya / অনন্যা ভট্টাচার্য
Art & Development: The Story of Patachitra 93
Kartik Manna / কার্তিক মান্না
Shunya Batik 96
Rimi Pati / রিমি পতি
আহারের কি বাহার! 98

ART & PHOTOGRAPHY

Biplab K. Datta 103
Paromita Ghosh 103
Suhas Sengupta 103
Sujit Bose 103
Satinath Sarker 103
Kamalaksha Das 103
Somesh Karanjee 103

MULTI MEDIA

Interview with Dr. Sushovan Banerjee 105
Interview with celebrated artists from Kolkata 106
Documentary: Pompeii Lakshmi - Link between Ancient India, Greece, & Rome 107

BAGA

Executive Committees (Previous Years) 108
Financial Report 111
Samapti 112
Pratichi 2020 - Editorial Board 113

Editorial

একটি উৎসব বহু জনের মিলিত আনন্দের প্রকাশ । গত পঞ্চাশ বছরের প্রবাসে শারদ উৎসবকে কখনো স্বদেশের মতো জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে মুখরিত করে পাইনি; তবে হৃদয়ের ভক্তিতে এবং দুর্গাপুজোর আনন্দযজ্ঞে উৎসবঘন মুহূর্তগুলির মধ্যে সার্থক ভাবে পেয়েছি ।

এ বছর অনিবার্য কারণে দুর্গাপুজো হৃদয় এবং উপলব্ধিতে সীমিত। করোনাভাইরাস আক্রমিত পৃথিবী আজ বিপর্যস্ত ; হতচকিত মানুষ বাঁচার তাগিদ ও জীবন যুদ্ধে বিক্ষিপ্ত । একবিংশ শতাব্দীতে এ এক অভূতপূর্ব জীবন সংগ্রাম পর্ব । তবুও অদমিত মানুষের গতি স্তব্ধ নয়। প্রকৃতি প্রেম, মানবিকতা, শিল্প, সৃজনীশক্তি এবং পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে বিশ্বচৈতন্যের এক অপূর্ব আলোকযাত্রা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ।

দিগন্ত বিস্তারিত নীল আকাশ ও প্রকৃতির সমারোহে মা দুর্গার আসন্ন আগমন । প্রিয়জন ও বন্ধু সমাগমহীন উৎসবে মা দুর্গাকে করজোড়ে আকুতি জানাই
"জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এস".....
মনের বিচরণ অবাধ তাই দেশ, বিদেশ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে, সেই মনের সৃষ্টির প্রকাশ ....সাহিত্য, শিল্পকলা, কোনো সীমানা মানেনা, অনায়াসে গ্রহীতার মন স্পর্শ করে ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতীচীর মুদ্রিত সংস্করণ এবার প্রকাশ করা সম্ভব হলোনা, কিন্তু বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার আটলান্টার দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আবহমান রেখে এবারের অলীক (online) ও একাধিক মাধ্যম যুক্ত (multimedia) প্রতীচীর প্রকাশ । আপনাদের মনোরঞ্জনের আশায় এবং সৃজনীর নতুন অভিজ্ঞতায় আমরা উৎসাহিত । পরিচালক মন্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কার্য্যকরী সমিতির অকুণ্ঠ সাহার্য্য ব্যতীত এই প্রকাশনা অসম্ভব ছিল । কিছু ভুল, ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী, আপনাদের মার্জনা প্রার্থী ।

মালবিকা (নীতা) বোস
সম্পাদিকা

Editorial

কোন দেবতার বরে এক ছোট্ট জীবাণু তার অমোঘ শক্তিতে রূপকথার দৈত্যের মতো সারা পৃথিবীকে গৃহবন্দী করে ফেলেছে । সারা বিশ্ব আজ স্তম্ভিত! অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভালোবাসার খেলাঘরে হানা দিচ্ছে প্রতিদিন। সে কতজনের যে ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তার গুনতি কেউ রাখে না। জীবনের বা জীবিকার ভাবনা এক অভাবনীয় জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এই ২০২০ সালে। যাঁরা আজ ক্ষত বা ক্ষতির সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তাঁদের কথা ভাবলে গা শিউরে উঠে।

তবু পরাভব আমরা মানি না। আমরা আশাবাদী। তাই এ বছর প্রচুর উদ্যমের সঙ্গে সূচনা হলো আমাদের বার্ষিক পত্রিকা প্রতীচীর বহু-মাধ্যম রূপ। এবারের প্রতীচী নিয়ে এসেছে নতুন ধাঁচে এক নতুন অভিজ্ঞতার আর অনুভূতির স্বাদ।

মানুষের মন পরম বিপদেই আশ্রয় নেয় ঈশ্বরের কাছে। তাই হয়তো অনেক ভয়ে, অনেক দুশ্চিন্তায় এবছর প্রকৃতই আমরা দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে ডাকছি নিজেদের ঘরে, নিজেদের মনের মধ্যে। অঞ্জলি দিচ্ছি শুধু ফুলে নয়, প্রার্থনায়। এই "অলীক পুজোর আলোয়" নিজেকে আমরা চিনতে শিখছি নতুন করে। সবার হয়ে যেন বলতে শিখছি:

"রোগানশেষাং অপহানসি তুষ্টা
রুষ্টাতু কামান সকলানভিষ্ঠান
ত্বম আশ্রিতনাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বম আশ্রিতা হি আশ্রয়তাম প্রয়ান্তি।"

রবীন্দ্র চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদকীয়

Editorial

Respiratory Illness জনিত Pandemic এর কথা ভাবলে স্বভাবতই ১৯১৮ সালের Spanish Flu আর বর্তমানের Covid-19 এর তুলনামূলক সাদৃশ্য আর বৈচিত্রের কথা আলোচনার শিরোনামে উঠে আসে। এক শতাব্দী আগে Spanish Flu র সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন Woodrow Wilson, যার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। Paris Peace Conference চলাকালীন–১৯১৯ এর তেসরা এপ্রিলে–প্রেসিডেন্ট Wilson হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে কাশতে শুরু করেন। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তো সন্দেহ করেই বসলেন প্রেসিডেন্টের শত্রুরা তাকে বিষ খাইয়েছে। পরে অবশ্য খলনায়ক হিসেবে Spanish Flu কে সনাক্ত করা গেল। এখন Covid এর সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে ইলেকশন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে তিনি নিজেও Covid এ আক্রান্ত হয়েছেন। Wilson এর সময়ে না ছিল ভ্যাকসিন, না ছিল উন্নত মানের চিকিৎসার পরিকাঠামো। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক Spanish Flu তে আক্রান্ত হয়েছিল। বিশ্বজোড়া মৃতের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি, যা বিশ্বযুদ্ধে মৃতের সংখ্যার দু গুণের ও বেশি। একা আমেরিকাতেই মারা গিয়েছিলো ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার লোক। তুলনায় Covid এ আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক কম, যদিও দুটোতেই আমেরিকা এখনো পর্যন্ত শীর্ষস্থানে। Spanish Fluর মতো Covid এর সময়েও বারংবার হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক, আর সামাজিক দূরত্ত বজায় রাখা ছিল রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক উপায়। Spanish Fluর সময় না ছিল প্লাসমা এন্টিবডি বা অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা কিংবা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সুযোগ। তিন বছর পরে বিশ্বের অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হয়ে যে Herd Immunity তৈরী হলো, তারই সুবাদে Spanish Flu এক সময় অন্তর্ধান করলো।

১৯১৮ র পর আমেরিকায় ছোট আকারে আরো তিনটি Respiratory Pandemic এসেছে যথাক্রমে ১৯৫৭, ১৯৬৮ আর ২০০৯ সালে। গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মতন এর পর ২০০৩ আর ২০১২ সালে আত্মপ্রকাশ করলো Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) আর Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS)। এই সব শ্বাসরুদ্ধকারী ভয়ঙ্কর সব রোগের নাম শুনে আমি বছর দুয়েক আগে কবিতায় লিখেছিলাম, "বিদখুটে সব রোগের নামে ধরছে মাথা ভারি, ভাইরাস আর ভ্যাকসিনেতে চলছে মারামারি !" Covid আমাদের জীবনের অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে। Work from Home এবার আটমাসে পদার্পণ করল। এই সদ্যজাত শিশু এতদিনে Zoom Meeting এ খুব পোক্ত হয়েছে। Director একদিন মিটিং এ জিজ্ঞেস করলেন ঘর থেকে কাজ করার সবচেয়ে সুবিধা কি? তাতে এক সহকর্মী র উত্তর: "Perfect Commute!" New York এর Health Commissioner, ডাক্তার David Chokshi, সেদিন মনে করাচ্ছিলেন Covid এর জন্য কত লোক তাদের regular স্বাস্থ্য পরীক্ষা পিছিয়ে দিচ্ছে। না হচ্ছে

Editorial

Diabetes, Cardiovascular Disease বা Depression এর checkup, না হচ্ছে কোনো elective surgery! বাচ্চাদের regular immunization ও শিকেয় উঠেছে। Covid একদিন বিদায় নেবে, কিন্তু এসব অগ্রাহ্য করা স্বাস্থ্য সমস্যা গুলো যখন দারুন রোষে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তাদের সামাল দেবে কে? তার কথাগুলোই দেখলাম দেশে Zee Bangla টিভি চ্যানেলে বারবার শোনাচ্ছে।

Covid আমাদের রোজকার lexicon কেও পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করতে বাধ্য করছে। গৃহবন্দী অবসাদগ্রস্থ মন কে চাঙ্গা করতে এসেছে Quarantini, যা হলো Quarantine আর Martini র অনবদ্য মিশ্রণ। অনবরত স্ক্রিনে স্ক্রোল করে "শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" ভাবার মনোবৃত্তির নাম হয়েছে Doomscrolling। আর Covid এর সময়ে জাত সন্তান-সন্ততি দের নতুন তকমা Coronnials! কদিন আগে এক প্রতিবেশী Covid এর টেস্ট করাতে যাচ্ছে শুনে প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম, "Be Positive"। কোনোক্রমে সে যাত্রায় বিপদ থেকে উতরেছি। এক সময় Flattening of the Curve ছিল CDC র Obesity Research এর পরিচিত tag line। Covid আজ সেটাকেও কুক্ষিগত করেছে!!!!

Covid এর প্রবল পরাক্রমের কাছে পরাভব মেনে এবার BAGA র পুজো হচ্ছে অন্তরালে, নেটের জালে। কবি'রা করুণ সুরে গান ধরেছেন, "মেরেছো করোনা'র কাঁটা, পুজোয় বন্ধ পথে হাঁটা।" আমরা সবাই উদগ্রীব প্রতীক্ষায় আছি কবে এই দুর্দিনের শেষ হবে। নানা বিধি আর নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে আমাদের প্রাণ ছটফট করছে। "আজ মুখেতে কাপড় গুঁজি, হাতে'তে দস্তানা। নাক ঝাড়া তো দূরের কথা, কাশ'তে গেলেও মানা।" এই দুর্দিনে আসুন সবাই চাই মায়ের বরাভয়: সবাই মিলে দুর্গাঠাকুর এই করি মিনতি, Covid কে তাড়ানোর করো কিছু গতি!

সজল চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদকীয়

From the President's Desk

My Dear BAGA Family,

It has been my honor to serve you as the President of your organization this year along with my highly efficient Executive team. Each year the Durga Puja strengthens our social bonding, in a far-away country that we call home. However, this year Puja comes amid pandemic, economic sufferings, and political unrests in the USA, reminding us the true virtue of Durga Puja: the victory journey of light over darkness, truth over untruth, and life over death!

Unlike other years, you do not have to drive to the venue, or fly down to Atlanta from other cities to attend the Puja, we are bringing the festivities to you in the safety and comfort of your home. We embarked on our journey as 2020 Executive Committee with the Saraswati Puja in February which was a grand success. Everybody enjoyed our presentations, decorations, food arrangements and above all, the last-together of the year. Our talented BAGA kids were fascinating and their performance will remain alive in our memory. The appreciation from our members made us more resilient and determined, though the pandemic forced us to choose virtual platform COVID-19 simply could not stop us!

We successfully executed our first virtual program Kabi Jayanti with a terrific success, followed by “The Bollywood Night" resulting in a bigger hit. The third virtual event “Jaya Jaya Durga” was organized on Mahalaya which included the **"**Tarpan**"** ritual to relive the memory of those beloved who are no longer with us. Every year, children from BAGA impress us with their talents and performances. The tradition goes on this year. On October 17th, thanks to many wonderful parents, BAGA is hosting an online kids’ program to showcase our kid’s talents.

Durga Puja 2020 begins on 23rd October. Despite unnatural circumstances, this year’s balanced artist lineup can rival any other year’s Durga Puja. The artists who will be performing this year include Indrani Sen and Kamolini (Rabindra Sangeet); Poushali and Dohar Band (Folk Genre), Shovan Sundar (Rabindra Kabita); Shaswati Phukan (Bollywood). On the 24th, it is with my immense pleasure, I announce that for the very first time BAGA will present Padma-Shri **Hariharan** and Jolly Mukherjee from Bollywood. It would have been an awe-inspiring moment to meet them in person, however, due to

From the President's Desk

safety precaution, we will have to enjoy their presence - virtually. Nevertheless, the experience will be unmatched!

In order not to miss out in participation of the Anjali or the Aarti, we shall perform the puja from a remote location which can be virtually experienced by member families through the live streaming of the events. Moreover, we have already distributed food coupons so members can collect and enjoy the food during the programs. For our annual Pratichi magazine, we are offering an unparallel online multimedia magazine experience with separate publications for children and adults. Thanks to the Pratichi team for making it happen. This year BAGA initiated a tremendous fundraising effort and contributed heavily towards charities in both the United States and India especially, for Covid-19 and Amphan relief. We thank all BAGA members and BAGA management for their generosity and dedicated efforts.

I want to express my gratitude to my Executive team, and to all members who extended their support, ideas, and advice. I respectfully mention our Senior members, our past and current BOD, EC and BYC members who guided BAGA wo where it stands today. Let us pray to Ma Durga, who epitomizes female strengths to guide us to the path of righteousness and seek her blessings for a brighter future filled with peace, happiness, and prosperity for all. Thank you!

Kishore Chakraborty
BAGA 2020 President

BAGA Board of Directors, 2020

Kiriti Gupta
Chairperson

Mohua Maity
Secretary

Mamata Paul
Director

Dibyendu De
Director

Ayan Banerjee
Treasurer

Dr. Anirban Majumdar
Joint Treasurer

BAGA Executive Committee, 2020

Kishore Chakraborty
President

Bishan Chandra
Vice President

Joyshree Chowdhury
Vice President

Apala Sen
Vice President

Avijit Saha
Vice President

Shantanu Paul
Treasurer

BAGA Extended Committee, 2020

Saraswati Puja – February 1, 2020 - DeSana Middle School

Purohit : Sailendra Banerjee
Puja Assistant : Gauri Banerjee, Soma De, Suparna Nath, Gargi Chakraborty and Sucheta Chakraborty
Decoration: Lahari Das, Shreya Mitra, Angshuman Guin, Arpita Gupta
Puja Sponsor: Dimple Majumder and Mamata Paul and Sukla Mondal
Cultural Program Committee: Joyshree Chowdhury, Apala Sen and Chandrima Roy
Food Committee: Bishan Chandra, Dimple Majumder, Sukla Mondal and Mallika Basu
Food Distribution Team: Arpita Gupta, Ruchira Roy, Pranabesh Das, Saumya Bhattacharya, Subhadra Gupta, Papia Das, Romeo Laskar, Sanjib Gupta, Dibakar Chandra, Saptarshi Roy and Somnath Dey
Vendor Coordinator: Rikia Saha

Kobi Jayanti : May 16, 2020 - Virtual Program

Cultural Program Committee: Joyshree Chowdhury, Apala Sen
Technical Team : Niloy Bhattacharya, Subhadra Gupta, Angshuman Guin, Shantanu Paul, Arindam Chowdhury and Avijit Saha

Bollywood Night : July 11, 2020 - Virtual Program

Cultural Program Committee: Joyshree Chowdhury, Apala Sen
Technical Team : Niloy Bhattacharya, Subhadra Gupta, Angshuman Guin, Shantanu, Arindam Chowdhury Paul and Avijit Saha

Mahalaya : September 19,2020 – Virtual Program

Cultural Program Committee: Joyshree Chowdhury and Apala Sen
Technical Team : Niloy Bhattacharya, Subhadra Gupta, Angshuman Guin, Shantanu Paul and Avijit Saha
Tarpan : Pradip K Bhowal

BAGA Kids Program: October 17,2020 – Live Program

Cultural Program Committee : Joyshree Chowdhury, Apala Sen and Mallika Basu
Technical Team : Shantanu Paul and Avijit Saha

Durga Puja: October 23rd ,2020 to October 25th, 2020.

Purohit : Sailendra Banerjee
Puja Assistant: Gauri Banerjee, Sucheta Chakraborty and Malini D Ghosh
Technical Team: Niloy Bhattacharya, Shantanu Paul and Avijit Saha
Food Committee: Bishan Chandra
Invitation Card: Bishan Chandra
Pratichi Team : Nita Bose, Rabindra Chakraborty, Soumitra Chattapopadhyay, Sajal Chattopadhyay, Paromita Ghosh, Rina Datta Chakravorty, Debasree Chatterjee, Parimal Majumder, Anil Chakraberti and Satinath Sarkar
Pratichi Cover Page Design : Indrajit Chowdhury
Fund Raising : Avijit Saha and Shantanu Paul

BAGA Events 2020

Dear BAGA Members, Patrons, Sponsors, and Volunteers,

We thank you for your support.

BAGA Executive Committee
BAGA Board of Directors

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

1820– 1891

বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার আটলান্টা র তরফ থেকে জানাই শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

আমন্ত্রিত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

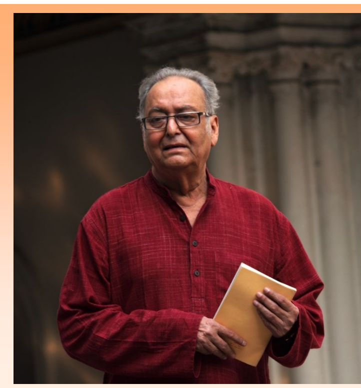

বাতিঘর লক্ষ্য করে

তীর কতদূরে ঠিক জানা নেই
তবুও তো কখনও কখনও মনে হয়
যেন এক বাতিঘর লক্ষ্য করে
ভেসে আছে আমাদের জীবন এ তরী

তীরে পৌঁছানো গেলে
তার পরে সকল সমস্যাগুলি মিটে যাবে
সর্বশেষ অবসানে
এক আরোগ্যের শুশ্রূষা এসে
স্নিগ্ধ করে দেবে
এমন স্থিরতা কি কিছু আছে ?

তবু ভ্রাম্যমান থেকে যেতে হয়
যত ত্বরা কর যত কেন পথে হাঁটো
তোমার স্বপ্নেরা আরও দ্রুতগতি
চলে যায় আনুপাতিক হয়ে
এমনই বিশ্বাসে
কোনো এক অদৃশ্য বাতিঘর স্বপ্নে দেখে
পান্থ তুমি থাকো ক্লান্তিহীন

যদিও শেষ দিন আছে
দুর্যোগ যদিও আসে শেষ হয়
আরও একবার ফিরে আসে অমল আশ্বিন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
গলফ গ্রীন
কলকাতা - ৭০০০৯৫

কবিতাগুচ্ছ

শ্রীজাত

টব

খুলেছি মানুষ চেয়ে শহরের জটা
পেয়েছি দিনের শেষ। সহনীরবতা।
তোমারও দেওয়ার ছিল মনের কিনারে
সাজানো ফুলের টব। পড়ে যেতে পারে।
প্রণয় পশম, সখি, উল্টো ঘরে বোনা।
ভালবাসা সোজা হলে বোঝাতে হতো না।

ঘুম

জেগেছ এমন, যেন রাত ছিল কত
আমি তো সকাল মানি। তুমি সহমতও
হয়েছিলে একবার। অবশ্য বিকেলে
বলেছ বুঝিয়ে দেবে খুব কাছে পেলে
কাকে বলে জাগরণ, ঘুম কাকে বলে
উভয়ই স্বপ্নের, প্রেম যতদিন চলে...

পড়া

আমার সাহস, সে তো ধ্বনিমরীচিকা
কবিতা জোটাতে চেয়ে কখনও পাঠিকা
মোম জ্বেলে বলেছেন, 'এত কি সহজ,
আমাকে পড়ানো লেখা?' আমি তাই রোজ
বানানের মাঝে ব'সে অপেক্ষায় থাকি।
আমাকে তো সে পড়েছে। তাকে পড়া বাকি।

কাজল

তোমাকে মানায় ভাল কাজলে, মিনারে
কিছু লোক ভালবাসা খালি চোখে পারে।
আমি সে-নজির নিয়ে কাছে এসে আজও
দেখিনি সমাজ ছেড়ে কীরকম সাজো।

কিছু তো নিজেরও আছে, অসচেতনতা
যা কিছুতে কারও নয়, সে তোমার কথা।

কৌটো

শেষে লেখা 'প্রীতি জেনো'। এইমতো চিঠি
ফেলা হল ডাকঘরে। বিষাদ অতিথি।
আমি তাকে খেতে দিই ডালের গভীরে
তোমার এই ছেড়ে যাওয়া। টিপ। কালো জিরে।

সারি সারি কৌটো রাখা, রান্নাঘরহীনা,
আমি যে কোনটায় বন্দি, খুঁজেই পাচ্ছি না...

ধুলো

সরলের মন তুমি। জটিলের পাখি।
মেলাশেষে রুমালেরা যেমন একাকী
তোমাকে দেখেছি তথা। অভাবের খনি
গরিবে কি দয়া হবে, স্মৃতিমেহগনি?

বালি জমে আছে গায়ে। ধুলো সামান্যই।
রাতে নদী। হাতে নিলে বন্ধুদের বই...

নিজের জন্যে কাঁদা

সমরেশ মজুমদার

পুরুষমানুষের শরীর চিতায় না ওঠা পর্যন্ত শান্ত হয় না। নইলে বাষট্টি বছরের লোকটা, যাকে বুড়ো ছাড়া কি আর বলা যায়, মাঝে রাত্রে দরজায় টোকা দেয়? লোকটা বিলক্ষণ জানে এ ঘরে আমি একা শুয়ে নেই। আমার পাশে ছোট মেয়ে আর নাতনি ঘুমাচ্ছে। নাতনি এসেছে আজ বিকেলে। ওর মা-বাবা আসবে কাল সকালে। বড় মেয়ের মেয়ে ও। তাছাড়া একবার আমার ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম আসে না আর এটাও লোকটার জানা আছে, তবু টোকা দিল? ঘুম ভাঙতেই দেখলাম ঘড়ির কাঁটা একটা দশে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কে? তেমনি চাপা স্বরে উত্তর এল, 'আমি।' চকিতে দেখলাম মেয়ে আর নাতনিকে। না, ওদের ঘুম ভাঙেনি। সত্যি বলছি, প্রথমে ভেবেছিলাম ওর শরীর খারাপ হয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই আলাদা ঘরে শুই। একা শোওয়ার ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। শরীর খারাপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই নিঃশব্দে দরজা খুললাম। খুলতেই আমাকে ইশারা করে নিজের ঘরে চলে গেল।

এবার সন্দেহ হল। তবু গেলাম। গিয়ে দেখলাম ওর ঘরে নিঃশব্দে টিভি চলছে। টিভির পর্দায়, দেখে আমি হতভম্ব। লোকটা নোংরা ছবি দেখছে? যার প্রেসার হাই, ব্লাড সুগার আছে সে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে গা-গোলানো ছবি দেখছে মহানন্দে? আমি টিভি অফ করে দিয়ে চলে আসছিলাম, ও ডাকল। এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, 'আধ ঘণ্টা থাকো, প্লিজ, ওদের ঘুম ভাঙবে না।'

মেজাজ গরম হয়ে গেল, 'তুমি কী? এ্যাঁ? এত বয়স হয়েছে তবু নোলা গেল না? ওইসব ছবি দেখছ? তোমার নাতনি হয়ে গেল জানো না?'

'আঃ। এর সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? তোমার তো এখন কিছু হওয়ার ভয় নেই।'

না নেই। সেই বারো বছর বয়সে যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে আট বছর আগে। কিন্তু শেষ হওয়ার আগে থেকেই শরীর আপত্তি করায় ওসব চিন্তা দূর করে দিয়েছি। এখন আমি একজন দিদিমা, মা এবং মিসেস অমুক। আমার বন্ধু শিপ্রা সুকলে পড়ায়। ও হেসে বলে, 'বাহির দুয়ার বন্ধ আজিকে ভিতর দুয়ার খোলা।' এখন ওসব চিন্তা মাথায় আসে না। ছোট মেয়ের বিয়ের কথা ভাবি, নাতনিটার ভবিষ্যতের চিন্তা করি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'এতই যদি ছোবল মারো, যাও না, যেখানে ইচ্ছে।' বলে চলে এলাম নিজের ঘরে। অবশ্য ঘরটা আর নিজের নয়, মেয়ে এবং আদুরে নাতনিরও।

ভোর হতেই তো যত কাজ সব একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়ে নাতনি উঠল। খবরের কাগজ এসে গেল। তার পরপর মেয়ে জামাইও। বাড়ি জমজমাট শুধু তার ঘুম ভাঙছে না। অত রাত পর্যন্ত ওসব দেখলে তো ঘুম থেকে উঠতে বেলা হবেই। বড় মেয়ে গেল তার বাবাকে ডাকতে। তার পরেই চিৎকার, 'মা, মাগো, তাড়াতাড়ি এসো।'

আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষটা বিছানায় পড়ে আছে, চোখ বন্ধ। দুই মেয়ে ওর বুকের ওপর মাথা রেখে কেঁদে চলেছে। জামাই ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। লিখে রাখছি, সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসবেন।' আমি কাঁদতে পারছিলাম না। প্রতিবেশি মহিলারা এসে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আমার কানে কথা ঢুকছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, ওর শেষ ইচ্ছাটা আমি পূর্ণ করতে পারলাম

না। আশ্চর্য! এই ইচ্ছের কথা কাউকে বলা যায় না।

ওরা ওকে নিয়ে গেল শ্মশানে। বড় মেয়েও সঙ্গে গেল। নাতনিকে জড়িয়ে ধরে চোট মেয়ে পাশের ঘরে কেঁদে চলেছে। ওরা ওদের বাবাকে এত ভালোবাসত?

আমি ওর ঘরে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে শব্দগুলো চলে এল, 'আধ ঘণ্টা থাকো, প্লিজ, ওদের ঘুম ভাঙবে না।' আমি মাথা নাড়লাম। এই ঘরের সর্বত্র ওর স্মৃতি ছড়িয়ে। সর্বত্র। ওর কলম, ঘড়ি, ডায়েরি, বইপত্র, ওর আলমারিতে জামাপ্যান্ট আরও কত কী।

আলমারিটা খুললাম। কিরকম ছেলেমি গন্ধ। এই আলমারিতে কত বছর হাত দিইনি। ওপরের তাকে নজর গেল। কাগজে মোড়া ওটা কী? টেনে নামালাম। বুঝলাম, এটা ছবি, কার ছবি এভাবে যত্ন করে রাখা। মোড়ক খুললাম। বিয়ের তিনদিন পরে দীঘার সমুদ্রের পাশে পেশাদারি ফটোগ্রাফারকে দিয়ে যে ছবি তোলানো হয়েছিল, যার কথা মনেই নেই আমার, তা এখন আমার সামনে ঝকঝক করছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগের আমি এবং সে।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলাম। নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না।

গত রাতে যদি আমি ওই বয়সের থাকতাম!

অজ্ঞাতবাসের সহবাস

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ একতিরিশ। তিনি শিলাইদহে। কখনও তিনি ভেসে বড়াচ্ছেন একা। ‘পদ্মা’ নামে বোটে, পদ্মার স্রোতে। কখনও নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে পদ্মার চরে। কখনও সাহিত্য, একাকিত্ব, ভাবনার চর্চায় কুঠিবাড়িতে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সমারোহ থেকে দূরে। স্ত্রী, সন্তান, সংসার থেকে দূরে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে। প্রত্যেহের প্রকাশ, প্রচার, প্রশংসা, পরিসর থেকে দূরে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন স্বনির্বাসন। এই দূরায়ণ ক্রমান্বিত হবে দশ বছর। কারণ, তিনি ক্রমে উপলব্ধি করেছেন, কোনও শিল্পীর পক্ষে অপরিণত প্রকাশ কত বড় সর্বনাশ। তিনি নিজের হাতেই নিভিয়ে দিয়েছেন সুসভ্যতার আলোক। বেছে নিয়েছেন পদ্মানদীর চর, অর পদ্মাতীরের ‘ধূ ধূ মাঠ’, যেখানে ‘অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখায় যায় না’, ‘যেখানে সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে’ যায়। গঙ্গার ধারে জন্মেও তরুণ রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন পদ্মার তীরে। এক নতুন রবীন্দ্রনাথ জন্মালেন সেখানেই। এই নতুন রবীন্দ্রনাথকে গঙ্গা জানে না। চেনে না। বিপুল বেদনা, সংশয় ও প্রত্যয়ের কল্লোলিত কলহের মধ্যে ক্রমে জন্মালেন এক নব বিস্ফোরণ ও উন্মোচনের রবীন্দ্রনাথ। তিনি পদ্মার সন্তান।

পদ্মারই কোলে, উত্তাল বর্ষার মধ্যে, ১৮৯২-এর ১৩ জুন, রবীন্দ্রনাথের নবচেতনা যেন অগ্নেয়গিরির আদিম জ্বলন্ত লাভা। লিখলেন ভাইঝি ইন্দিরাকে : “এ-সব শিষ্ঠাচার আর ভাল লাগে না---আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই---‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!’ বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা! দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি।... একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাধিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম!... এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য---মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি, মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন।” এই ঠেসে-ধরাকেই ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কেন বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না রবীন্দ্রনাথের? আষাঢ় মাসের ভরা বষলায় পদ্মার তীর থেকে জানালেন রবীন্দ্রনাথ : “মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিন-রাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায়, এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে---বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যারটোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায়নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে!’

কিন্তু এই মানুষগুলোর সঙ্গ তো তিনিও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন!

সমাজ-সংসারে এ-ছাড়া উপায় কী! এই নব-উন্মোচিত রবীন্দ্রনাথ দীর্ণ হচ্ছেন বেদনায়। হতাশ হচ্ছেন, সত্যিই তিনি চুরমার করতে পারছেন না বলে শহরের মেকি সমাজ ও সভ্যতা! লিখছেন নিজেকে তীব্র তিরষ্কার করের : ‘কী, আমি ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে

কথাবার্তা করে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদ্র---আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারী সুন্দর অরজাকতা নেই৷ কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! এই নতুন বরীন্দ্রনাথ নিশ্চিত, পালাতেই হবে মানুষের সংসর্গ ও সঙ্গ থেকে৷ প্রয়োজন সামাজিক দূরায়ণ, মানুসিক স্বাস্থ্যের জন্য৷ একাকিত্বের গৌরব, নিঃসঙ্গতার ঐশ্বর্য, ধ্যান ও মগ্নতার অবদান আমরা করে বুঝতে পারব, যেমনভাবে বুঝেছিলেন উপনিষদের ঋষি? রবীন্দ্রনাথ মনের কথাটি ভিতর থেকে উপড়ে বের করে এনে জানালেন ইন্দিরাকে : 'আমার মত হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস, বিজনবাস অবশ্যক৷ এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়, এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিজেকে সকলের চোখের সামনে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবার কাল নয়৷ যে সময় গঠন থাকে সেই সময়টা অত্যন্ত গোপনীয় সময়৷'

পদ্মার তীরেই 'গঠন' হল রবীন্দ্রনাথের৷ দীর্ঘ দশ বছরের নিঃসঙ্গ সাধনায় তৈরি হলেন তিনি৷ পদ্মাপারে স্বনির্বাসনের ধূ ধূ একাকিত্ব ছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথ হতেন না৷ ১৮৯০-এ রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারের সাজাদপুর থেকে চলে যান লন্ডনে৷ আর সেখান থেকে লেখেন এক সর্বনেশে চিঠি৷ এই চিঠির বিস্ফোরণে না আছে গঙ্গা৷ না আছে টেমস৷ আছে পদ্মার প্লাবন৷ তিনি ভাইঝিকে লিখলেন : 'মানুষ কি লোহার কল, যে ঠিক নিয়ম অনুসারে চলবে?' চিঠির প্রথম লাইনই ধাক্কা দেয় আমাদের৷ এই চিঠির লেখক কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অতীব বাধ্য পুত্র রবি? মহর্ষির পুত্র এমন বেয়াদপ চিঠি লিখতে পারেন তাঁর ভাইঝিকে?

'মানুষের মনের এত বিচিত্র ও বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা---তার এত দিকে গতি---এবং এত রকমের অধিকার যে, এদিকে-ওদিকে হেলতেই হবে৷'

এদিকে-ওদিকে হেলা মানে? এইটের তো পছন্দ করেন না মহর্ষি৷ এদিক-ওদিক হেলার দুর্বলতার জন্য পুত্র রবিকে শাস্তি দিয়েছেন মহর্ষি৷ মহর্ষির আজ্ঞাতেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন রবি৷ সেই নিরন্তর বাধ্য পুত্রটি শেষ পর্যন্ত কী করে লিখতে পারলেন এই ভয়ংকর সত্য কথাটি, যা ভিতরের সব বাধা ভেঙে, দ্বিধা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল : এই দুর্বলতা, এই এদিক-ওদিক হেলাটাই 'তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যতের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ৷'

রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামতে পারতেন৷ থামেন নি৷ তাঁর এই অসহনীয় গলন, এই ভয়াবহ বিস্ফোরণকে নিয়ে গিয়েছেন এক অবিশ্বাস্য, অসহনীয় বিন্দু পর্যন্ত৷ অন্তত ইন্দিরার পক্ষে অসহনীয় রবিকাকার এই আকস্মিক নতুন আত্মপ্রকাশ : 'যাকে আমরা, প্রবৃত্তি বলি, এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি, সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি৷' সন্দেহ নেই, এ একেবারে এক 'আউটসাইডার' রবীন্দ্রনাথ, যিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হয়েও দ্বিধাহীন ভাষায় প্রবৃত্তিকে বসাচ্ছেন গৌরবের আসনে! প্রবৃত্তিই আমাদের মনুষ্যতের চিহ্ন? জড়ত্বের প্রতিবাদ? রবীন্দ্রনাথ কী করে লিখতে পারলেন, 'যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনী শক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে, এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই৷ আমি এই যে...'

এইখান থেকে চিঠিটি ছেঁড়া! কে ছিঁড়লেন, ইন্দিরা ছাড়া? পাছে মানুষ তাঁর রবিকাকার এই নব উন্মেষকে 'ভুল' বোঝে তাই বাকি চিঠিটা চিরদিনের জন্য লুপ্ত করে দিলেন ইন্দিরা? না কি ছেঁড়া অংশটি লুকনো আছে বিশ্বভারতীর আরকাইভে?

প্রেমে পড়েছেন এই নতুন রবীন্দ্রনাথ৷ পদ্মা নদী তাঁর নতুন নারী৷ কেমন সেই মেয়ে, সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি৷ দিবারাত্রি ভেসে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোটে৷

লিখছেন, 'এই যেন আমার নিজের বাড়ি।' এই বাড়িতে পিতা দেবেন ঠাকুরের শাসন নেই। সংসারের কোনও চাপ, কোনও কর্তব্য, কোনও দাবি নেই। এমনকী নেই সামাজিকতার ঝামেলা। প্রাত্যহিক কাজরে ব্যস্ততা। 'এখানে আমিই একমাত্র কর্তা। এখানে আমার উপরে, আমার সময়ে উপরে, আর-কারও কোনও অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরনো ড্রেসিং গাউনের মতো---এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়---।'

কেমন এই ঢিলে অবসর? সেকথা এইভাবে লিখতে শুধু রবীন্দ্রনাথই পারেন। ঈর্ষনীয় এই সহজ সাবলীল অনর্গলতা : 'যেমন ইচ্ছে ভাবি, যেমন ইচ্ছে কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।'

প্রেম করেন না রবীন্দ্রনাথ? করেন বইকি। পদ্মার সঙ্গে। কেমন সেই মেয়ে? ঠিক যেমন পছন্দ রবীন্দ্রনাথের, তেমন। 'খুব বেশি পোষ-মানা নয়। কিছু বুনোরকম---কিন্তু ওর পিঠে এবং হাতে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।'

পদ্মা মেয়েটি দেখতে কেমন? রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান। এই মেয়েকে কোন পুরুষ চাইবে না জীবনে? পদ্মা এক পান্ডুবর্ণ কৃশকায় ছিপছিপে মেয়ে, 'সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে।' কিন্তু এ-মেয়ে ডেঞ্জারাস। পদ্মার সঙ্গে সহবাসে যে কোনও দিন মারা যেতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনিবার্য রিস্ক তিনি নিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পদ্মার শাখা নগর নদীর উঠল ভীষণ ঝড়। রবীন্দ্রনাথের বোট বুঝি এই যায় ডুবে! মাঝিরা চিৎকার করছে। আর তারই মধ্যে তরুণ রবি লিখলেন এই প্রেমের গান : 'আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা/ তব নব প্রভাতের নবীন শিশির ঢালা।' এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকেন না রবীন্দ্রনাথ। আরও এক প্রেয়সী আছে। 'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগদত্তা হয়েছিল।' কেমন এই মেয়ে? পদ্মার মতো বিপজ্জনক? না, তা হয়তো নয়। কিন্তু কবিতা সম্পর্কে চেপে কথা বলেননি রবীন্দ্রনাথ। জানিয়েছেন, 'মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়---আর যাই হোক সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।... এক এক সময়ে কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিন্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।'

এই লক্ষ্মীছাড়া রবি ঠাকুরই পদ্মার পার থেকে ১৮৯৩-এর ৮ মে লিখলেন, 'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে---সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র অবস্থান।'

পদ্মা এবং কবিতা, এই দুই প্রেয়সীর সহবাসে নিজের সম্বন্ধে এই গভীর সত্যটি আবিষ্কার করলেন তরুণ রবি। সে কি সামান্য ব্যাপার?

পৃথিবী

রুদ্রশংকর

আমাকে ভাসায় উজ্জ্বল উৎসব
আমার চোখে অচেনা স্বপ্ন ভাসে
গোলাপী রোদে জীবাণুর পরাজয়
আকাশপারে আনন্দ-ঢেউ আসে

ভুলে গেছে তারা জন্মের জাতপাত
ভুলে গেছে তারা ঘরবন্দীর সুখ
খিদের দেশে নবান্ন ডেকে যায়
সংলাপে সুখী নতুন পুরনো মুখ

কার হাত ধরে উন্নত বিজ্ঞান?
কার হাত ধরে থেমে গেছে প্রগতি?
এ'সব দ্বন্দ্ব মানুষের নির্মাণ
ডানা মেলে দেয় সচেতন প্রকৃতি

পৃথিবীটা তার আবার উঠবে জেগে
এ'রকম ছিল সামাজিকতার দায়
মা, বাবা তাদের ফিরে পাবে সন্তান
প্রতিদিন আমি তোমাকে পড়তে চাই!

এসপার ওসপার

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

হাই ডার্লিং! কী খবর?

খবর? দারুণ ভালো। আর, আধঘন্টার মধ্যেই পেয়াদা এসে যাচ্ছে!... পরে কথা বলছি রে।

যা ব্বাবা! যখনই তোকে ফোন করি, তখনই তুই বিজি। টু মাচ রিমি!

আরে বাবা, বেকার গাল ফুলোচ্ছিস! জানিস না, এখন স্কেলিটন স্টাফ দিয়ে পেপারগুলো বেরোচ্ছে? আমাদের ডেস্কের সেভেন্টি পার্সেন্ট আসে সাবার্ব থেকে। যে কটা কাছেপিঠে থাকি, মরছি ! রোজ গাড়ি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, না বলার উপায় নেই। আর একবার ঢুকে পড়লে-- হয়ে গেল ! ঘ্যাসঘ্যাস করে করোনা কেত্তন লিখে যাও। রেকর্ড মৃত্যু, রেকর্ড আক্রান্ত। মৃত্যু রেকর্ড করছে, আর মিডিয়ার আমরা আনন্দে নাচছি! সো ডিপ্রেসিভ!

হুম! কাছে থাকাটাই তোর কাল হয়েছে!

তা নয়তো কি! দেড় মাস ধরে কোম্পানির সব্বাই স্যালারি পাচ্ছে। বাড়িতে দিব্যি ল্যাদ খাচ্ছে। আমরা ক'জন খেটে মরছি। তা তোরও তো এক অবস্থা, নাকি?

ইয়েস, সেম কন্ডিশন। বাট আমার খারাপ লাগছে না। ইয়ে বলছিলুম আজ কি একটু দেখা হতে পারে?

দেখা! তুই কি পুরো পাগলে গেছিস অতনু ? আরে হাঁদা, বললুম না, অফিসের গাড়ি তুলে নিয়ে যাচ্ছে! পাতি পুল কার। একটা ধ্বজা সুমোয় পরপর চারটেকে তুলছে। ফেরার সময় পরপর নামাচ্ছে।

আঃ--! তুই একটা হাঁদা। আজ ফেরার সময় ধর গাড়িতে উঠবি না! টুক করে আমি তোকে বাইকে তুলে --

তোর মাথাটা গেছে! শোন খোকন, নো ওয়ে। ফুল এমার্জেন্সি সিচুয়েশন। এডিটরের স্ট্রিক্ট ইন্সট্রাকশন আছে, পিক আপ ফ্রম হোম অ্যান্ড ড্রপ টু হোম। মাঝে নো ড্রপ। এই রে--! তোর সঙ্গে ভ্যাকভ্যাক করতে গিয়ে আমার কিছুই হয়নি!

ওয়ান সেক, ওয়ান সেক... প্লিস...

ওরে, এখন ছাড়। অফিসে গিয়ে তোকে ধরছি।...

খচাং করে কেটে দিল রিমি।

আমি থুম মেরে দাঁড়িয়ে! ইমপসিবল! আর নিতে পারছি না। এক দু দিন নয়, পঁয়তাল্লিশ দিন ওর সঙ্গে আমার দেখা নেই। ডিসগাস্টিং!

রিমি আছে দিনকাল পত্রিকায়। আমি আছি নিউজ চব্বিশ চ্যানেলে, রিপোর্টার। ওর সঙ্গে আমার সাত বছরের সম্পর্ক। দুজনেই একসঙ্গে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে মিডিয়া কমিউনিকেশনে গ্র্যাজুয়েশন করেছি। তারপর যা হয়! আলাপ থেকে প্রেমপর্বে পৌঁছতে ৬ মাসের বেশি লাগেনি।

দু' বাড়ির গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে গেছি, সেও প্রায় একবছর। একসাথে বেশ কয়েকবার আউটিং-এ গেছি, সারা দিন বাইরে কাটিয়েছি ধারেকাছের রিসোর্টে। সেখানে দুজনে প্রচুর খেলাধুলোও করেছি।

আমাদের ফাইনাল ম্যাচের দিনটা এসেও গেছিল। গত অক্টোবরে আমরা কনফারমেশন লেটার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেট ফাইনাল। এই মে মাসের সতেরো। বিয়ে বউভাতের বাড়ির বুকিং কমপ্লিট।

ঠিক এইসময়েই বজ্রাঘাত! কোত্থেকে শালার

একটা ভাইরাস এসে সব বারোটা বাজিয়ে দিল। এ এমন একখানা চিজ, যাকে খালিচোখে দেখা যায় না। নিঃশব্দে এসে একজন থেকে আরেকজন... এইভাবে কোটি লোককে ধরে ফেলেছে। আর ধরা মানে...এমনি ছাড়ছে না! রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে লাশের সংখ্যা বাড়ছে।

সব লকডাউন! তালাবন্ধ। বাপের জন্মে এই শব্দটা শুনিনি। সব বন্ধ, গাড়িঘোড়া ট্রেন বাস প্লেন প্রাইভেট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সব সব বন্ধ। আর কী সব টার্ম ! আমরা তো কোন ছার, আশি নব্বই বয়েসের মানুষরাও কোনকালে এসব নাম কল্পনাও করেননি। কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন, পিপিই, করোনা কিট আর-আর সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং! সব্বাই বাড়িতে বন্দী। ব্যবসা, দোকান , কারখানা সব লকডাউন।

অতএব আর কী! ঘাটের ঠিক মুখে এসে ভুস করে বিয়ের নৌকোটা ডুবে আছে বিশ বাঁও জলে। সব ক্যানসেল। বুকিংএর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা স্রেফ বরবাদ।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কী অবস্থায় আছি!

নাঃ, আর নয়, যে করে হোক, আজকালকের মধ্যে হবু বউয়ের সঙ্গে কোথাও একটা... তারপর... আঃ! হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হো...!

পকেটের ফোনটা টুং টুং। দুসস্ শালা! যা ভেবেছি, তাই।

হ্যালো, সুবীরদা! বলো।

অতনু, তুই কদ্দূর?

এ-এই রেডি হচ্ছি দাদা! মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরোচ্ছি।

ইমপসিবল! এনি হাউ তোকে পনেরো মিনিটের মধ্যে অফিস ঢুকে যেতে হবে!

কেন দাদা? তুমিই তো কাল বললে, এগারোটা নাগাদ আসতে। এখন তো মোটে সোয়া দশটা।

আরে ভাই, এমার্জেন্সি! কাল কী বলেছি, ভুলে যা। এখন যা সিচুয়েশন, সবসময় রেডি থাকতে হবে। নাহলেই চ্যানেলের টিআরপি ধড়াস্! বুঝলি। কুইক কুইক।

বলছিলুম দাদা, মা ভাত নিয়ে --

ভাত! সরি, নো চান্স। অতনু, লিসন, এক্সক্লুসিভ নিউজ অফ আওয়ার চ্যানেল! আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্যামেরার বিজেশ দশ মিনিটে এসে যাচ্ছে। ওকে নিয়ে তোকে ফার্স্ট নিমতলা, তারপর চৌবাগা... লাশ! বুঝলি, পাঁজা পাঁজা লাশ! অন্য মিডিয়া স্পটে পৌঁছনোর আগেই আমাদের ছবি যাবে-- ব্রেকিং নিউজ, পুরোটা লাইভ হবে।...

মা-- মা, আমি বেরোচ্ছি। অফিসের ফোন। ভাত ফ্রিজে ঢুকিয়ে দাও।

বাইক স্টার্ট করে দিয়েছি। আমাদের চ্যানেলের অফিস গড়িয়াহাটের কাছে। মোবাইল দেখলাম। হ্যাঁ, ইসিলি পৌঁছে যাব।

সত্যি, ভাবা যায় না! এটা পিক অফিস টাইম। নরম্যাল কন্ডিশন হলে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিট থেকে বাইকেও মিনিমাম আধাঘন্টা লাগত অফিস ঢুকতে। সেই পথ এখন লাগে ম্যাক্সিমাম বারো মিনিট।

সাঁ সাঁ করে বাইক ছুটছে। খাঁ খাঁ এপিসি রোড। ধারে ধারে বাস, প্রাইভেট, ট্যাক্সি, লরি দাঁড়িয়ে আছে। দু একটা সিগন্যালে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে। এক দুটো স্টিকার বা লালবাতি গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স ছুটে যাচ্ছে। ঠেলা নিয়ে এক আধটা সবজিয়ালা। ব্যস, এটুকুই। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে, যেন ঘুমন্ত কলকাতা। এরকম অচেনা শহর কেউ কখনও ভাবতে পেরেছিল !

করোনার এই বিভীষিকাকে মাথা থেকে সরিয়ে রাখতে পারলে এই লকডাউনের কলকাতা, হ্যাঁ সত্যি

এনজয়েবল। কোথাও হই হট্টগোল নেই, ঝুট ঝামেলা, মিটিং মিছিল নেই, বাস গাড়ির ধোঁয়া হর্নের বিকট শব্দ নেই। সিনেমায় দেখা ইউরোপের ছবির মতো কোনও এক শহর। আকাশটা ফ্লুরোসেন্ট নীল, পাখির ঝাঁক উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে গাছে।

তাছাড়া পজিটিভ ব্যাপারও ঘটেছে। চ্যানেলগুলো ধুঁকছিল। এখন জাস্ট রিভার্স। করোনার ভয়ে বেশিরভাগ বাড়িতে খবরের কাগজ নিচ্ছে না। কাগজেও নাকি মালটা কিছুক্ষণ অ্যাকটিভ থাকে, শোনা যাচ্ছে। অতএব নিউজ চ্যানেলদের পোয়াবারো। রকেটের গতিতে আমাদের টি আর পি চড়ছে।

বাইক পার্ক করতে করতে দেখলাম, চ্যানেলের একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বিজেশ সিগারেট ফুঁকছে। গলায় মাস্ক। হাতে গ্লাভস। আমাকে দেখে এগিয়ে এল, গুরু, শিগগির যাও। সুবীরদা ছটফট করছে। গাড়িতে ক্যামেরা লোড করে দিয়েছি।...

আয়, আয়, ভিতরে আয়। চট করে অ্যাসাইনমেন্ট বুঝে নে। নো টাইম।

ক্ -কী হয়েছে দাদা?

শ্-শ্-শ্। সুবীরদা আমাকে হাত ধরে টেনে এনে চেম্বারে বসালেন, ইডিয়ট! চুপ। দেয়ালেরও কান আছে। এখন সবার হাতে মোবাইল। সিক্রেসি ইস মোস্ট ইমপরট্যান্ট। এক সেকেন্ডে পুরোটা পাচার হয়ে যাবে।

ফিসফিস করে বললেন, ভাবতে পারিস, আজ দু দুখানা এক্সক্লুসিভ! জাস্ট আধঘন্টা আগে পেয়েছি। বাঙ্গুরে সিক্সটি প্লাস এক পেশেন্ট নাকি আজ সকালে করোনায় মারা গেছে। কিন্তু মহিলার ফ্যামিলি ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। তারা খবর চেপে দিয়েছে। জেনারেল হার্ট ফেলিওর ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে ডেডবডি বের করে নিয়ে রওনা হয়েছে। তাদের বাড়ি মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট। মহিলার নাম, অ্যাড্রেস হোয়াটসঅ্যাপ করছি। প্রথমে যাবি ওদের বাড়িতে। ওদের ফ্যামিলি হেডকে ধরবি। সে অবভিয়াসলি কিছু বলতে চাইবে না। বলবে না তো বলবে না! তুই বুম নিয়ে নিজেই লাইভ শুরু করবি। বি ভেরি কেয়ারফুল। ওই লোকগুলো অ্যাটাক করতে পারে। আর যদি দেখিস, ওরা বাড়ি থেকে--

বুঝে গেছি দাদা। ওখান থেকে সিধে নিমতলা। নিশ্চয়ই নন-বেঙ্গলি? তা'লে শিওর কাঠ। ডোন্ট ওরি দাদা, ঠিক খুঁজে নেব। সেকেন্ডটা বলো।

এটা এক্সপ্লোসিভ! সত্যি মিথ্যে জানি না। সুবীরদার ফিসফিস আরও খাদে নেমে গেল, আজ সকালে আমার সোর্স হোয়াটসআপে ভিডিওটা পাঠাল! এই যে।...

বুকপকেটের ফোনটা ঢাংঢুং করে বেজে উঠল। নির্ঘাত মা। ছেলে না খেয়ে বেরিয়েছে-- এইরে! রিমি!

হ্যালো, এখন কথা বলতে পারছি না, আর্জেন্ট মিটিং। পনেরো মিনিটে ফোন করছি।...শিওর, শিওর।...

সুবীরদা মুচকি হেসে মোবাইলটা এগিয়ে দিলেন, বুঝেছি, রিমি। রিয়েলি ভেরি স্যাড। কী আর করবি... এই যে, ভালো করে দ্যাখ। বাড়ির ছাদ থেকে মোবাইলে তুলেছে।

আগুন... আগুন মনে হচ্ছে..।

রাইট। চিতার আগুন। এটা একটা টেম্পোরারি ক্রিমেশন গ্রাউন্ড। করোনার ভিকটিমদের পোড়াচ্ছে। বাট ইটস নট ধাপা।

অ্যাঁ ! ধাপা নয়? ওখানেই তো লাশ পোড়াচ্ছিল। এটা আবার কোথায়?

ওই যে ফোনে বললাম তোকে। চৌবাগা। ধাপা থেকে আরও অনেকখানি এগিয়ে ভাঙড় ক্রসিং। সবটাই লুকিয়ে হচ্ছে, বুঝলি।

কিন্তু দাদা... জায়গাটার একটা লোকেশন পয়েন্ট না পেলে...

মিস্টার অতনুবাবু--! সুবীরদা হেসে উঠে বললেন, একজন রিপোর্টার ডিটেকটিভের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। কুছ চমৎকারি তো দিখাও! তবেই না তুমি অতনু পাল। শোন, তোকে একটা ক্লু দিচ্ছি। সেটা হল, আমার যে সোর্স ভিডিওগুলো পাঠিয়েছে, তার বাড়ির

গুগল লোকেশন দিচ্ছি। ওর বাড়ির কাছের কোনও একটা ফাঁকা মাঠে ব্যাপারটা ঘটছে। চারিদিকে কিন্তু প্লেন ড্রেস পুলিশ ঘিরে আছে। সাবধান।... নে, বেরিয়ে পড়। বেস্ট অফ লাক।...

গাড়ি ছুটছে নর্থ ক্যালকাটার দিকে। সুন্দরীমোহন এভিনিউকে মনে হচ্ছে যেন এক্সপ্রেস ওয়ে। উত্তেজনায় ফুটছি।

এই য্-যা! রিমির কথা ভুলেই গেছিলাম।

হ্যালো। সরি, দেরি হয়ে গেল রে!

বাব্বা! কী এমন রাজকার্য ছিল তোর?

ছিল, ছিল। সেই অপারেশনেই যাচ্ছি। তুই কেবল অফিসে একটু থেকে যাস, আমি অফিসে গাড়ি ছেড়ে তোকে তুলে নেব।

না সোনা, সে গুড়ে বালি! ওদের সুমোতেই বাড়ি ফিরতে হবে।

য্-যাচ্চলে। তোর অফিসে তো আমাদের ব্যাপারটা সবাই জানে। তুই না রিমি--

ওয়েট, ওয়েট। তুই কি মনে করিস, আমি বলিনি? পবিত্রদা স্ট্রেট বলে দিয়েছেন, এডিটরের অর্ডার! ওকে। তালে আর কী! এইরকমই চলুক। একটা প্লেসেন্ট সারপ্রাইজ আছে তোর জন্যে। শুনবি কি?

সারপ্রাইজ! কীরকম?

তুই আমাদের বাড়ি চলে আয়। আমি সাড়ে ছটায় ফিরে যাব।

ধ্যাত! এটা সারপ্রাইজ? এর আগে অ্যাট লিস্ট তিনবার বলেছিস। আমি রিফিউজ করেছি। কেন করেছি, তুই জানিস। তোমার বাড়ি যাব, অমনি তোমার মা সেজেগুজে এসে একথালা মিষ্টি সামনে ধরবেন, আর তোমার সরকারি বড়কত্তা বাবা সামনে বসে হ্যাজাতে শুরু করবেন। আর এখন তো একটাই টপিক-- করোনা। তিনিও উঠবেন না, তুমিও কিছু বলবে না। সরি, আমি যাচ্ছি না।

তোর বলা হয়েছে? নাকি আমার কথা শুনবি? শুনছি।

শোন, একটু আগে মা ফোন করেছিল। বলল, মামার ফোন এসেছিল। দিদার শরীরটা কাল রাত থেকে খারাপ করেছে। তাই বাবা মা এখন বর্ধমান ছুটছে। অ্যান্ড ইটস অবভিয়াস, এখন বেরিয়ে ওরা আজ ফিরতে পারবে না। দিদাকে স্টেট হসপিটালে ভর্তি করার ব্যাপার আছে। কিছু বুঝলি?

হৃদপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে।

কি- কিন্তু তোদের ওই মায়া মাসি?

সে আর কোথায়? সে তো লকডাউনের আগেই দেশে চলে গেছে।

আইব্বাস! বলে কী রে? মুহূর্তে শরীরে জ্বর, চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্গের নন্দনকানন! ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি...! আজ শালা এসপার নয় ওসপার!

গুরু, এসে গেছি। ওই যে ২৮ নম্বর। বিজেশ একধাক্কায় সব সুখস্বপ্ন চুরচুর করে দিল।

না রে, চলে গেছে। নিমতলা, কুইক।...

মোক্ষম সময়ে পৌঁছে গেছি। কাঠ সাজাচ্ছিল, বিজেশ ক্যামেরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু দূর থেকেই ঘাড়ে ক্যামেরা তুলে মহিলার ছবি তুলে যাচ্ছে। কে এদের ফ্যামিলি হেড, বুঝে ফেলেছি। কিন্তু ওকে ধরার কোনো চান্স নেই। লোকটার কাছে এগিয়ে যেতেই চারপাশ থেকে একপাল ছোকরা তেড়ে এল, যাইয়ে! আভিভ যাইয়ে।

হাওয়া সুবিধের নয়। আরও লোকজন এগিয়ে আসছে। রীতিমত চিল্লাতে শুরু করেছে, ইয়ে মিডিয়া লোগোকো সবক শিখানা পড়েগা।...

গুরু, চলো বেরিয়ে চলো। আমি ছবি নিয়ে নিয়েছি। বাইরে থেকে লাইভ হবে। বিজেশ আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, ছুটে বেরিয়ে এলাম।

এরপর যা হয়! শ্মশানকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে আমি ভাটাতে শুরু করলাম, আমরা নিমতলা মহাশ্মশানে।... হাতে নাতে ধরে ফেলেছি....। এই মহিলা আজ সকালে....। পাশে পাশে বিজেশের ভিডিও চলছে।

ওদের দলবল অনেক। দু চারটে বোধহয় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের লোকেট করে ফেলেছে!

খেয়েছে! একটু দূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে, দুই মক্কেল ঝটপট উঠে পড়েছি। কালুদা অভিজ্ঞ, সে সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়ে দিল।...

থ্যাঙ্কিউ বস। এবার চৌবাগা।

চৌবাগা মানে ভাঙড়ের দিকে? সেখানে কী কেস গো?

আছে আছে। তুমি কাছাকাছি এলে বোলো, আমি গুগল ম্যাপ অন করব।... অ্যাই বিজেশ, একটা সিগারেট দে।

সিগারেট! বিজেশ ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হয়ে বলল, অতনুদা! কোনকালে তো খেতে দেখিনি। সত্যি খাবে?...

হ্যাঁ রে। বহুত টেনশন।

ইএম বাইপাস। বাঁদিকে আদিগন্ত ঝিল, পরপর মাছের ভেড়ি। হু হু হাওয়া উঠে আসছে। রোদ্দুরের তাত নেই, আকাশ মেঘলা করে এসেছে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে, আমেজে চোখ বুঁজে আসছে।

আঃ! আর মাত্র কিছুক্ষণ। তারপর আজকের সন্ধেটা...ওদের ফাঁকা বাড়ি... শুধু রিমি আর আমি... তারপর... দুজনে... দুজনে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি... নাইট ল্যাম্পের নীলাভ আলো... আবছা অন্ধকার... উঃ! সব দেখতে পাচ্ছি, রক্ত ছোটাছুটি করছে, আগুনের হলকা বেরোচ্ছে শরীর দিয়ে...।

ও অতনুদা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ফের দুম করে সুখস্বপ্ন ভাঙিয়ে দিল বিজেশ, চৌবাগার মোড় এসে গেছি। এবার?

গুগল ম্যাপে লোকেশন সেট করছি।... আস্তে আস্তে চলো। এক কিলোমিটার।

আধা গ্রাম। কিছুদূরে একটা মোড়। আড়াআড়ি সরু পিচ রাস্তা। গুগল দেখাচ্ছে, এবার ডানদিকে ঢুকতে হবে । একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকান। অর্ধেক ঝাঁপ নামানো। ভেতরে লুঙিপরা একটা লোক । এখান থেকেই চোখে পড়ল, ঠিক মোড়ের মাথায় দুটো ষণ্ডা একটা কাটা গাছের গুড়িতে বসে আছে।

কালুদা, থামো। এখানেই গাড়ি রাখো।... বিজেশ, নেমে আয়। উঁহু, নো ক্যামেরা।

ক্যামেরা নেব না? তাহলে ---

কেন, তোর কাছে ফোন নেই? সিগন্যাল দেব, লুকিয়ে ভিডিও তুলতে শুরু করবি! স্টিং অপারেশন জানিস না? এই দ্যাখ, বুমটা প্যান্টের পেছনে গুঁজেছি।

নিরীহ মুখ বানিয়ে ঢুকে পড়েছি চা দোকানে।

দাদা, দুটো চা হবে?

লোকটা ভ্রু কুঁচকে আমাদের দেখল। বলল, কোথায় যাচ্ছেন বাবু ?

বেদিক ভিলেজে চাকরি করি। আপনার দোকান খোলা দেখে -- এদিকটা এত সান্নাটা কেন গো? লোকটোক দেখছি না।

কী করে দ্যাখবেন? পরশু থেকে সব আটকে দিইছে। বাইরে থেকে একদল বাবু এয়েছে, তেনারা এট্টু পরে চা খেতে আসবে।... হঠাৎ ওর চোখমুখ পাল্টে গেল, না বাবু। আমি কিছু জানি না।...চা হবে না। যান, যান।

রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। বিজেশ পাশ থেকে বলল, বস্, ভিডিও নিয়ে নিয়েছি।

মোড়ের ছোকরা দুটো উঠে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে ফোন করলাম, সুবীরদা। নাম বলো। বলতে হবে, নাহলে আর এগোতে দেবে না।

বলবি, বলবি... একসেকেন্ড, মনা কাকার বাড়ি।

ছোকরা দুটোর কোমরে হাত।

কোথায় যাবেন ছার? কোত্থেকে আসেন?

কলকাতা থেকে আসছি। মনাকাকার বাড়ি যাব। টাকা নিতে আসতে বলেছিল।

টাকা? মাছের কারবার আপনাদের?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বারবার ঘোরাচ্ছিল, শেষে আজ ডেট দিয়েছে। যাব আর চলে আসব।

ছেলেদুটো চোখাচোখি করল। একজন বিড়বিড় করে বলল, মনাদা এখন হলুদ পার্টিতে না?... আরে, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান।

জোরে জোরে হাঁটছি। সামনে একটা আমবাগান। কয়েক পা এগিয়েছি, কোত্থেকে চার পাঁচটা পুলিশ রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেল, কী ব্যাপার? কারা আপনারা?

পুলিশের অফিসারটা সব শুনে মাথা নাড়ল, না মশাই। আর যাওয়া যাবে না।

কেন স্যর? এই আমরা যাব, চলে আসব। ওখানে কি কিছু সমস্যা হয়েছে স্যর?

সমস্যা! কীসের সমস্যা? ওপরের অর্ডার আছে, বাইরের কেউ অ্যালাউ নয়। তাই যেতে পারবেন না।

ওহো। তাহলে তো খুব চিন্তার ব্যাপার স্যর। মনাকার বয়েস হয়েছে, মানে করোনা টরোনা তে ওনার কিছু-

না না মশাই। ওসব হয়নি। এখানে টেস্টিং কিট তৈরি হচ্ছে।...সেজন্যেই- বুঝলেন।

না...কাকার কাছে অনেকগুলো টাকা পেতাম...

দূর মশাই! বলছি পারমিশন নেই, এক ঘ্যানঘ্যান!... একটাই হেল্প করতে পারি। আপনার কাকাকে ফোন লাগান। আমাকে ধরিয়ে দিন। আমার ফোর্সের একজনকে পাঠাব, তার হাতে আপনার টাকা দিয়ে দেবে। কী, এবার খুশি তো?

অ্যাঁ! খুশি? ফুল কেস জন্ডিস!

ফোন নিয়ে ফলস নম্বর টিপতে শুরু করে দিলাম। বারবার কানে ধরছি, আর মাথা নাড়ছি, না স্যার, লাগছে না।

তা'লে আর কী করবেন! পরে আসবেন।...

উরেব্বাপ! কী বাঁচা বেঁচে গেছি। করুণ মুখ বানিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই মোড়। তারপর প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা। সুবীরদাকে পুরো রিপোর্ট করা কমপ্লিট। বলা বাহুল্য, পুলিশের সঙ্গে আমার পুরো কথাবার্তা বিজেশ ভিডিও তুলে নিয়েছে।

২৪ মনোহরপুকুর রোড। আমার বাইক রিমিদের গেটের সামনে। তামা তামা লোগে তামা... আজ তেরা কেয়া হোগে রিমিয়া?

অফিসে সবসময় আমার একসেট জমকালো ড্রেস থাকে। জমিয়ে চান করে, পারফিউম স্প্রে করে তৈরি হয়েই এসেছি। মাস্কটাও নতুন, সুবীরদা দিলেন। লকডাউনে আরেক উপসর্গ, যখন তখন নেটওয়ার্ক উড়ে যাচ্ছে। বেরোনোর আগে রিমিকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছি, পাইনি। মেসেজ করে রেখেছি। এখন আবার আমার দুটো ফোনের কোনটাতেই টাওয়ার নেই। ও বেচারি পাবে না।

বাড়ির সামনে একটুকরো বাগান। ব্যালকনিতে আলো জ্বলছে।

অ্যায়সা মওকা আওর কাঁহা মিলেগা...! ওদের বাইরের গ্রিল গেটটা আলতো করে তুলে ভেতরে ঢুকতেই হৃদপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে নাচতে শুরু করল।

রিমি বাগানে!

আরেব্বাস! আজ লালহলুদ ছোপ ছোপ চুড়িদার পরেছে আমার হবু বউ। কী সুন্দর লাগছে রে!

সরু পাইপ দিয়ে টবে জল দিচ্ছে রিমি। আজ কোনও কথা হবে না, টোটাল সিনেমার রোম্যান্টিক সিন।

পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। তিন চার পা দূরত্ব। রিমি পিছন ফিরে একমনে গাছে জল দিয়ে যাচ্ছে। টেরই পায়নি।

মুখোশ, ইয়ে মানে মাস্কটা খুলে প্যান্টের পকেটে রাখলাম। শরীরে চিড়িক চিড়িক! পরক্ষণে চিতাবাঘের মতো তড়াক করে একটা লাফ! দু হাতে ওকে জাপটে ধরেই ওর কানের লতিতে আলতো কামড়---! সঙ্গে

সঙ্গে একটা রামঝটকা!

ক্- কে রে? একখানা চিল চিৎকার।

মুহূর্তে আমি ছিটকে গেছি। কেলেংকারির মাথায় বাড়ি! ছি ছি ছি... এ আমি কী করলাম!

দশ সেকেন্ডের মধ্যে তিন লাফে বাইরে। পরের পাঁচ সেকেন্ডে বাইক স্টার্ট। পিছন থেকে অবশ্য একটা গলা ভেসে আসছিল।

কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। পাগল পাগল লাগছে। স্টুপিড ইডিয়ট উজবুক গাধা গামবাট... প্রাণভরে নিজেকে খিস্তি দিয়েও শান্তি হচ্ছে না।

বিশুদার চায়ের দোকানে থামতেই একটা মোবাইল বেজে উঠল।

খিলখিল হাসি।

ত্- তুই হাসছিস? ত্-তুই ---

আরে ভাই, তোকে বলব কী করে? যতবার করছি, আউট অফ নেটওয়ার্ক। হেলথ সেক্রেটারি বলে দেওয়ায় দিদাকে স্টেট হসপিটালে ভর্তি করে নেয়। তখন বাবা মা ঠিক করে, আজ না গিয়ে কাল সকালে যাবে। মা যাবে বলে রেডি হয়েই ছিল।... আরে... অ্যাই অতনু... চুপ করে আছিস কেন? আরে, এ-এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। হতেই পারে।

মারাংবুরু

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

শিমুল গাছের ডালে একজোড়া হাজারিকা বাসা বেঁধেছে। পুরুষটির পেটের অংশ টুকটুকে লাল। পিঠ উজ্জ্বল কালো। মেয়ে পাখিটির পিঠ ধূসর আর জলপাই মেশানো। নিচের দিকটা হলুদ। সন্ধে ঘন হয়ে ঝাঁঝকো আঁধার নেমেছে। এখনও 'টুই টুই' করে নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে পাখিদুটো। পাখিদুটোকে গাছের অন্ধকারে খোঁজার চেষ্টা করছিল দ্রৌপদী। ঠিক তখনই একটা পাখির পালক হাওয়ায় ভেসে নেমে এল নিচে। দ্রৌপদী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশে বসা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল। হলুদ পালকটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লিটা। পালকটা মাথায় গঁজল। তার কালো পাথরে কোঁদা দীর্ঘকায় শরীরে এসে পড়ল পূর্ণ চাঁদের আলো। দ্রৌপদী মুগ্দ চোখে তার মরদকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, মারাংবুরু !

এতক্ষণ দুজনে মিলে গেয়েছে। নেচেছে। আবার নতুন উদ্যমে ধামসাটা তুলে নিল লিটা। ধামসা বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠল - যা গোঁসাই মারাংবুরু জাহের আয়ু / নাই বা পায় তেগে আয়ু বাবা / আলে সালাম মানমি / না পায় তেগেলে তাহেন মা / আবেন নিয়ে আলে কাঁড়া মাননি / আপে নিয়ে আলে থত মাননি লে / সেটের আকানা এ ..।

এই গান লিটা শিখেছিল পিপড়াডি থেকে। ঝাড়খণ্ডের সেই গাঁয়ে তার মামা রামচন্দ্রর ডেরা। ওদিকে মারাংবুরু পুজোর চল আছে। পুজোর সময় এই গান গায় ভক্তরা। মারাংবুরুকে পাহাড়দেবতা বলা হলেও তাঁর চেহারা শিবঠাকুরের মতো। দুটো হাত, তিনটে চোখ, মাথায় জটাজট, হাতে ত্রিশূল, পরনে বাঘছাল, গলায় সাপ। রামচন্দ্র বলেছিল, চাষে ভাল ফলনের জন্য প্রত্যেক বছর আষাঢ় মাসের ত'তীয় শনিবার মারাংবুরু পুজো হয়। নারকোল, বাতাসা, ধূপধুনো, ফল নিবেদন করা হয় ঠাকুরকে। আশেপাশের গ্রাম থেকে আসে পুজোর সামগ্রী, বলির পাঁঠা আর মোরগ। মারাংবুরু দেবতার আর এক নাম 'লিটা'। সেই পাহাড়দেবতার নামেই ভাগের নাম রেখেছিল রামচন্দ্র।

পূর্ণিমার চাঁদ হলদে আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে চারদিক। অজ তারা মিটমিট করছে আকাশ জুড়ে। জরি বসানো আঙরাখা গায়ে জড়িয়ে রেখেছে পৌষালি রাতের আকাশ। মৃদুমন্দ হাওয়া দিচ্ছে। পৌষের বাতাসে হিমকণা মিশে আছে। কিন্তু পেট ভর্তি হাঁড়িয়া থাকায় দুজনের কারও মধ্যে শীত শীত ভাবটা নেই। আজ বড় আনন্দের দিন। ঠিক এমন দিনেই বিয়ে হয়েছিল তাদের। সেদিনের সব কথাই মনে আছে দ্রৌপদীর। গায়ে হলুদের দিন তিনজন অবিবাহিত মেয়ে গান গাইল। শালপাতার তিনটে বাটিতে বাটা হলুদ রাখা হল। একটা বাটির হলুদ রাখা হয়েছিল মারাংবুরু আর জাহের দেবতার জন্য। পুরোহিত বললেন, দেবতারা, তোমরা অলক্ষে থাকলেও এই শুভকাজ সম্পন্ন করো। সোনার শিকল ছিঁড়ে গেলেও কথা ও সুতোর বাঁধন যেন কখনও না ছেঁড়ে। পাখির উপমা দিয়ে গাওয়া হল বিয়ের গান।

লিটাদের সমাজে বরযাত্রীকে বলে বাবিয়াত। পলাশতলি চা বাগান থেকে একশোর মতো মানুষ গিয়েছিল বরযাত্রী হয়ে। বিয়ের দিন চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা আর একটা ছাগল নিয়ে লিটারা দ্রৌপদীর বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে অপেক্ষা করছিল। কনের বার্তাবাহককে

মারাংবুরু - মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

বলা হয় গোড়েৎ। সে এসে বরণ করল বর ও বরযাত্রীদের। এর পর ধীরে ধীরে বরপক্ষ বিয়েবাড়ি পৌঁছল। প্রথমে বর ও বরযাত্রীকে স্নান করানো হল। দ্রৌপদীকে প্রথা মেনে হলুদ শাড়ি দেওয়া হয়েছিল লিটাদের বাড়ি থেকে। মারাংবুরুকে প্রণাম করে, দেবতাকে প্রণামী দিয়ে ডালায় বসেছিল দ্রৌপদী। হাসাহাসি হচ্ছিল। বিয়ের আসরে আদিরসের কথা বলাবলি করছিল কেউ কেউ। লিটা তখন তার বোনজামাইয়ের কাঁধে। আতপচাল ছুঁড়ে দিচ্ছিল দু'জন দু'জনের দিকে। আমপাতা দিয়ে ছিটিয়ে হল মঙ্গলকারি। তিনবার ঘোরার পর মাটিতে তিনবার সিঁদুর লেপে দ্রৌপদীর বাঁ হাতে লোহার চুড়ি পরিয়ে দিয়েছিল লিটা। সূর্যদেবতাকে সাক্ষী মেনে দ্রৌপদীকে কোলে তুলে নামিয়ে দিয়েছিল নিজের বাঁ পাশে। বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। শুরু হল খাওয়া দাওয়া, নাচ গান। খাসির মাংস আর হাঁড়িয়া দিয়ে রাতভর চলল ভোজ।

নেশাটা বেশিই হয়ে গেছে। মাথাটা এতাল বেতাল করছে। লিটা বসে পড়ল দ্রৌপদীর পাশে। হাজারিকা পাখির মতোই সুন্দর লাগছে দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদীর শরীরের কুহক গন্ধে জেগে উঠেছে লিটা। বউকে লিটা আদর করছিল, চুমু খাচ্ছিল পাগলের মতো। প্রমত্ত রতিক্রীড়ার শেষে লিটা নিজেকে বিযুক্ত করে আনল দ্রৌপদীর থেকে। গলা খাকারি দিয়ে বলল, ঠাকুরদাস কী বলেছে মনে আছে তো? কাল সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিতে হবে।

দ্রৌপদীর হাঁড়িয়ার নেশা কেটে গিয়েছিল লিটার কথায়। একদৃষ্টিতে তার মরদের দিকে তাকিয়ে ছিল দ্রৌপদী। সেই জলন্ত চোখের দিকে তাকাবার ক্ষমতা ছিল না লিটার। অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল লিটা।

২

- আপনাদের মধ্যে কেউ 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' উপন্যাসটার নাম শুনেছেন? একটা হলিউডি ছবিও হয়েছিল। সেটা দেখেছেন কেউ? সাংবাদিকদের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন বদ্রি শর্মা।

দু'বারের সাংসদ বদ্রি শর্মাকে পলাশতলিতে তাঁর দল পাঠিয়েছে নির্বাচনী সভা করতে। জনসভা শেষ হয়েছে। বদ্রি এখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। ভেবেছিলেন কোনও উত্তর আসবে না। কিন্তু তাঁকে বিমিত করে একজন বলে উঠল, আপনি কি বিটিশ ঔপন্যাসিক এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটন-এর উপন্যাসটার কথা বলছেন?

বদ্রি চশমা পরা মেয়েটির দিকে তাকালেন। পলাশতলির মতো জায়গায় কেউ এই কথা বলবে তিনি আশা করেননি। বদ্রি বললেন, উপন্যাসটা পড়েছেন আপনি? মেয়েটি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ স্যার। ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে পম্পেই নগরী ধংস হয়ে গিয়েছিল। সেটাই উপন্যাসটার স্টোরিলাইন।

বদ্রি বলে উঠলেন, ঠিক। পম্পেই যেদিন ধংস হয়ে যায় সে দিন অ্যাম্পিথিয়েটারে খেলা দেখাতে আনা হয়েছিল

মারাংবুরু - মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

এক বাঘ ও সিংহকে। সকলে ভেবেছিল, তারা আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত দেবে পরস্পরকে। কিন্তু সে দিন তারা লড়তে চায়নি। কোনও এক আতঙ্কের পূর্বাভাস পেয়ে তারা ছিল একেবারে শান্ত। এখানে এসেও দেখছি ভোট নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে মানুষ। আতঙ্কে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছে না। কিন্তু আপনারা মিলিয়ে নেবেন, শাসকের অপশাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষই এবার উল্টে দেবে শাসকের গদি। আজ দুপুরে যেটা হয়েছে সেটা তো কিছুই নয়। আরও বড় ভূমিকম্প আসছে। ইলেকশনের রেজাল্টের দিন সেটা বুঝতে পারবেন।

আজ বদ্রি বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে এসে পৌঁছেছেন এখানে। উঠেছেন ডাকবাংলোতে। দুপুরে স্নান সেরে সবে খেতে বসেছেন তখনই ঘটেছিল ঘটনাটা। ডাকবাংলোটা সজোরে কেঁপে উঠেছিল। কুক, নাইটগার্ড, আর্দালি হুড়মুড় করে নেমে এসেছিল বাগানে। সকলের চিৎকার আর হাঁকাহাঁকিতে বদ্রি নেমে এসেছিলেন নিচে। পরে জানা গেল, নেপালের পাহাড়ে কোথাও প্লেট সরে গেছে। তাই হিমালয় সংলগ অ'ল কেঁপে উঠেছিল একটুক্ষণের জন্য। বদ্রি পোড় খাওয়া রাজনীতিক। বক্ত'তার মধ্যে ভূমিকম্প প্রসঙ্গটা সুচারু ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আজ। বদ্রি ঠোঁট থেকে হাসিটাকে মুছে নিলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, এদিকের মানুষ ভাল নেই। বন্ধ চা বাগানের খেতে না পাওয়া শ্রমিকরা কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। পেটের ভাতের জন্য দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হচ্ছে মহিলারা। পম্পেইয়ের ভূমিকম্পের কারণ ছিল আগেয়গিরির জেগে ওঠা। যে ভিসু্ভিয়াসকে সবাই জানে শান্ত, সেখানে আচমকা হয়েছিল আগেয় বিস্ফোরণ। হিমালয় সংলগ এই অ'লও তো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে বেশ কয়েকবার। বহু দূরে হিমালয়ে কখন একটা প্লেট আর একটা প্লেটের নিচে ঢুকে গিয়ে এই অ'লটাকে কাঁপিয়ে দেবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু একমাত্র মানুষই পারে ভোটের বা ে' জবাব দিয়ে শাসককে কাঁপিয়ে দিতে।

সাংবাদিক মেয়েটি প্রগলভ হল, পম্পেইয়ের শেষ দিনে রোমান নৌবহরের সেনাপতি প্লিনি দ্য এল্ডার দেখতে পেলেন আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে ছাই দিয়ে। নদীতে বয়ে আসছে গলিত লাভার ে াে। বেশ ক'জনকে বাঁচিয়ে প্লিনি নিজে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। রোমান সভ্যতায় বীর নায়করা ছিলেন। কিন্তু এই একুশ শতকে কোথা থেকে রোমান বীর আসবে? বদ্রি প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষই বীর রোমান যোদ্ধা। সাধারণ মানুষের ওপর আমাদের আস্থা আছে। তারাই উল্টে দেবে শাসকের গদি। পাল্টে দেবে সব অংক।

৩

বড় রাস্তার মোড়ে ঠাকুরদাস উদ্বিগমুখে অপেক্ষা করছিল। দ্রৌপদী আর লিটাকে দেখে তার মুখে হাসি ফুটল। লিটাকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে ঠাকুরদাস দেশলাই বের করে নিজে একটা বিড়ি ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল ওদিকে। দেশলাই ফেরত নেবার কথা মনে নেই তার। আজ ঠাকুরদাসের ওপর সাংঘাতিক চাপ। মিটিংয়ে লোক না নিয়ে যেতে পারলে মুখ থাকবে না। দেশলাইটা পকেটে রাখতে গিয়ে লিটার আঙুল লাগল কিছুতে। হাতে উঠে এল কাল রাতের সেই পালকটা। ফেলতে গিয়েও কী ভেবে পালকটা আবার রেখে দিল পকেটে।

লরি চলতে শুরু করেছে। চা বাগানের ঘ্রাণ নাকে আসছে। এই গন্ধ লিটার বড় প্রিয়। চা বাগানটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। একদিন মালিকপক্ষ ফ্যাকট্রিতে আচমকা তালা দিয়ে পালিয়ে গেল কলকাতায়। রাতারাতি কাজ চলে গেল সকলের। বাগানের কুলিকামিনরা কেউ গেল অন্য বাগানে পাতা তুলতে। কেউ গেল কেরালায় জন

মারাংবুরু - মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

খাটতো৷ লিটা গিয়েছিল পিপড়াড়ি৷

রামচন্দ্র প্রান্তিক চাষি৷ সেবার অনাবৃষ্টিতে ফসল হল না রাজ্যে৷ রামচন্দ্র শহরে গিয়ে সরকারি অফিস আর ব্যাংকে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও লোনের ব্যবস্থা করতে পারল না৷ হতাশায়, রাগে, দুঃখে পোকা মারার ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল লোকটা৷ চাষের জমিতে মুখে গ্যাঁজলা ওঠা রামচন্দ্রের মৃতদেহ পড়ে ছিল৷ মরার আগে রামচন্দ্র একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে৷ লেখা ছিল, ক'ষকদের সাহায্য করার নামে প্রতি বছর ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হবে এমন ঘোষণা যেন আর না করা হয়৷ কারণ ব্যাংকের ঋণের সুবিধে পায় বড় চাষিরা৷ প্রান্তিক ক'ষক পায় না৷ রামচন্দ্রের চিঠি কি পৌঁছেছিল জায়গামতো? জানে না লিটা৷

রামচন্দ্র মারা যাবার পর পিপড়াড়ি থেকে শূন্য হাতে লিটা ফিরে এসেছিল৷ তার পর কখনও খালিপেটে থেকে, কখনও আধপেটা খেয়ে তাদের দিন কেটেছে৷ এই বন্ধ হয়ে যাওয়া পলাশতলি চা বাগানের সকলেরই একই অবস্থা৷ এবার ঠাকুরদাস সবাইকে বুঝিয়েছে দিল্লি থেকে বড় লিডার আসছে৷ বন্ধ চা বাগানের লেবারদের নিয়ে তৈরি হবে পরিচালন কমিটি৷ তারাই নতুন করে চালাবে বন্ধ চা বাগান৷ আজকের মিটিংয়ে তাই যেতেই হবে সবাইকে৷

লরিটা চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘ্যাঁষ করে৷ সোরগোল করছে যাত্রীরা৷ সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল লিটা৷ পিচঢালা রাস্তার একদিকে বড় বড় গাছ৷ অন্যদিকে চা বাগানের ঢেউ৷ সেই কালচে ফিতের মতো রাস্তাটাকে কেউ যেন দোলাচ্ছে৷ এদিক ওদিক করছে বড় বড় গাছগুলো৷ বাকিদের সঙ্গে লিটা এক লাফে পাকা সড়কে নেমে ভিড়ের মধ্যে দ্রৌপদীকে খঁজছিল৷ বিমিত হয়ে লিটা দেখে দ্রৌপদী ট্রাক থেকে নামেনি৷ পাথরের মূর্তির মতো ঠায় বসে আছে৷ দুলতে থাকা রাস্তাটা একমনে দেখছে৷ চোখেমুখে আতঙ্কের কোনও ছাপ নেই৷

৪

সিঙ্গল মল্ট৷ মদ জিনিস৷ গলা দিয়ে নামার সময় হোঁচট খায় না কোথাও৷ দু'পেগ হয়ে গেছে৷ আর দু'পেগ অবধি এগোবেন৷ তারপর গ্লাস উল্টে দেবেন৷ বিপি হাই৷ কোলেস্টরলের পারদ উঁচু মাত্রায় চড়ে বসে আছে৷ ফ্যাটি লিভারের ফার্স্ট স্টেজ৷ কিন্তু কারণবারি পান আর মেয়েছেলে ঘাঁটা যদি না-ই থাকল জীবনে তাহলে আর থাকলটা কী! বদ্রি গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে 'অ্যাহ' করে একটা শব্দ করলেন৷ জিজ্ঞাসা করেন, তোদের কি প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল?

পুরনো কাটিংয়ের ঢোলা জিনস আর নাইলনের গেঞ্জি পরা লিটা বসে আছে বেতের চেয়ারে৷ গালে দু'দিনের দাড়ি৷ কোঁকড়া চুল৷ কালো পাথরে খোদাই করা দশাসই

চেহারা। লিটা গলায় কুণ্ঠা মিশিয়ে বলল, না সাব, সম্বন্ধ করে।

বদ্রি প্লেট থেকে লবণাক্ত কাজু মুখে তুলে বলেন, শ্বশুরবাড়ি থেকে কত টাকা পণ নিয়েছিলি?

ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে পুরুলিয়ার ছৌ নাচের একজোড়া মুখোশ। মুখোশদুটোর তাকিয়ে ছিল লিটা। মুখ ফিরিয়ে বলল, মেয়ের বাড়ি থেকে পণ দেওয়ার চল নেই আমাদের।

বদ্রি শর্মা আলগোছে হাতঘড়িটা দেখেন, পকেট থেকে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়ে বলেন, কাল সকাল সকাল আমি বেরিয়ে পড়ব। তুই একটু বেলার দিকে এসে তোর বউকে নিয়ে যাস। লিটা টাকাগুলো নেয় হাত পেতে। পকেটে ঢুকিয়ে রাখে চুপচাপ। ধীর পায়ে মাথা নিচু করে দরজার দিকে এগোতে থাকে। ভারী হয়ে যাওয়া পা দুটোকে টেনে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পকেট থেকে বিড়ি বের করে ঠোঁটে গোঁজে। ডাকবাংলোর কর্মীরা শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে। সব ঘরের আলো নিভে গেছে। নিচতলায় ভিআইপি রুমটায় নীল রাতবাতি জ্বলছে। সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে লিটা। বড় করে শ্বাস ফেলে একটা।

অন্ধকার ফুঁড়ে ঠাকুরদাস নিঃশব্দে লিটার পাশে এসে দাঁড়ায়। লিটাকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা বিড়ি ঠোঁটে গোঁজে। পকেট হাতড়ায় আগুনের সন্ধানে। দেশলাই খুঁজে পায় না। লিটা প্যান্টের পকেটে হাত দেয়। দেশলাইয়ের সঙ্গে কাল রাতের পাখির পালকটাও উঠে আসে তার হাতে। পালকটা রেখে দেয় যথাস্থানে। বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দেয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খায়। লিটা ধূসর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠাকুরদাস আলতো হাত রাখে লিটার পিঠে। ঘুরে দাঁড়ায় লিটা। ঠাকুরদাসকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। অপ্রস্তুত ঠাকুরদাস হুমড়ি খেয়ে পড়ে। লিটার উদ্দেশে অশ্রাব্য গালি দেয়। হাঁচোর পাঁচোর করে উঠে ধুপধাপ পা ফেলে চলে যায় অন্যদিকে।

বড় বড় মানুষজন আর পার্টির হোমরাচোমরারা পলাশতলি এলে প্রয়োজনে রাত গুজরান করেন ডাকবাংলোতে। কারও কারও কাঁচা চামড়ার নেশা থাকে। আড়কাঠি আছে। তারাই সব কিছু সেট করে দেয়। এদিক ওদিক থেকে কলেজে পড়া মেয়েরা চলে আসে বাপ-ঠাকুরদার বয়সি লোকগুলোর সঙ্গে রাত কাটাতে। বদ্রি শর্মাও এই রসের রসিক। সারাদিন পার্টির কাজে দৌড়ঝাঁপ করার পর রাতে একটু রিলা' করলে শরীর আর মন দুইই ভাল থাকে। এবার বদ্রির শখ হয়েছে চা বাগানের কোনও কালো মেয়ের সঙ্গে শোবেন। টাকাপয়সা নিয়ে তাঁর কার্পণ্য নেই। তবে হ্যাঁ, কাকপক্ষীও যেন কিচ্ছুটি না জানে।

বন্ধ বাগানের মেয়েদের চেহারা জুতের নয়। হাড়জিরজিরে দশা সকলের। কিন্তু প্রক'তির খেয়ালে ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকা দ্রৌপদীর শরীর থেকে চেকনাই যায়নি এখনও। বদ্রি শর্মার জন্য ঠাকুরদাস বেছে রেখেছিল দ্রৌপদীকে। একদিন সন্ধেবেলা লিটার কাছে এসে চাপা স্বরে পেশ করেছিল প্রস্তাব। ঠাকুরদাসকে এক ধাক্কায় ফেলে লিটা উন্মত্তের মতো লাথি মেরেছিল তার তলপেটে, বুকে, অণ্ডকোষে। সেই রাতে তাদের চুলা জ্বলেনি। রাগী বাঘের মতো পায়চারি করে সারাটা রাত কাটিয়েছিল লিটা। উপোসী পেটে দ্রৌপদীও জেগে বসেছিল ঘরের দাওয়ায়। পরদিন ধূর্ত শেয়ালের মতো আবার এসেছিল ঠাকুরদাস।

কাঁসার থালার মতো চাঁদটা ঝুলে ছিল কুলিলাইনের ওপরটায়। কালো আকাশের বুকে ঝিকমিক করছিল অগুনতি নীল নীল তারা। শালশিমুলের জঙ্গলে দপদপ

মারাংবুরু - মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

করে জলছিল জোনাকির আলো৷ রাতজাগা কোনও পাখি তীক্ষ্ন স্বরে ডেকে উঠছিল থেকে থেকে৷ আবছা দেখা যাচ্ছিল বাবুদের কোয়ার্টার, চা-ফ্যাক্টরি, চা-বাগান, মানিজারের বাংলো, হাসপাতাল৷ একসময় সব বিল্ডিংয়েই লাইট জলত, দূর থেকে ভেসে আসা মানিজার আর বাগানবাবুদের গলা পাওয়া যেত৷ এখন কেউ থাকে না ওদিকে৷ পুরনো দিনের ম'তি বুকে পুষে বসে আছে বাড়িগুলো৷

ধামসা বাজাচ্ছিল লিটা৷ দ্রৌপদী গাইছিল সু্ুর করে - 'আর গেঁলয় পাউষ ঋতু ঘরে নখঁয় মোর সখিয়া অকবক মোঁয় তো তেজঁবু পরাণ রে .. '৷ সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছিল বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের ওদিক থেকে৷ শ্রান্ত হয়ে এক সময় বসে পড়েছিল দু'জনে৷ বাপের কথাগুলো মনে পড়ছিল লিটার৷ ছোটনাগপুরের ওদিকে বিলাসপুর, নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা থেকে লোক ধরে এদিকের চা বাগানে নিয়ে এসেছিল আড়কাঠিরা৷ গোরা সাহেবরা তাদের বানিয়ে দিয়েছিল বণ্ডেড লেবার৷ ক্রীতদাসের মতো ছিল জীবন৷ কথায় কথায় চলত চাবুক৷ পুরুষ-মহিলা বাছবিছার নেই, চলত অমানুষিক অত্যাচার৷ লেগে থাকত পাশবিক ধর্ষণ৷ স্বাধীন মানুষগুলো এভাবেই পরাধীন হল৷ জলুমবাজির নতুন ইতিহাস তৈরি হল চা বাগানে৷

লিটার বাপ বলত, চা গাছকে বাড়তে দিলে চা গাছ লম্বায় দোতলা বিল্ডিং ছাড়িয়ে যায়৷ তাহলে দুটো পাতা আর একটা কঁড়ি ছেঁড়া যাবে কী করে ! তাই ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হয়, চা গাছকে বাড়তে দেওয়া হয় না কিছুতেই৷ মরা বাপের কথা মনে পড়ায় মনটা এখন কেমন যেন করছে৷ নিস্ফল রাগে একদলা থুতু ফেলল লিটা৷ তাদের মতো সব কুলিকামিনকেই তো বেঁটেবামন করে রেখেছে এই সমাজ!

লিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ডাকবাংলোর দিকে৷ প্যান্টের চেন খুলল এক টানে৷ শরীরে সমস্ত জোর নিয়ে আসার চেষ্টা করল তার শিশ্নে৷ ডাকবাংলোর দেওয়াল ভেজাতে লাগল পেচ্ছাব দিয়ে৷ একসময় মুত্রথলীর ভাঁড়ার শেষ হয়ে গেল৷ ধপ করে হাঁটু মুড়ে ওখানেই বসে পড়ল লিটা৷ একটা রাতজাগা প্যাঁচা ডেকে উঠল আশেপাশে কোথাও৷

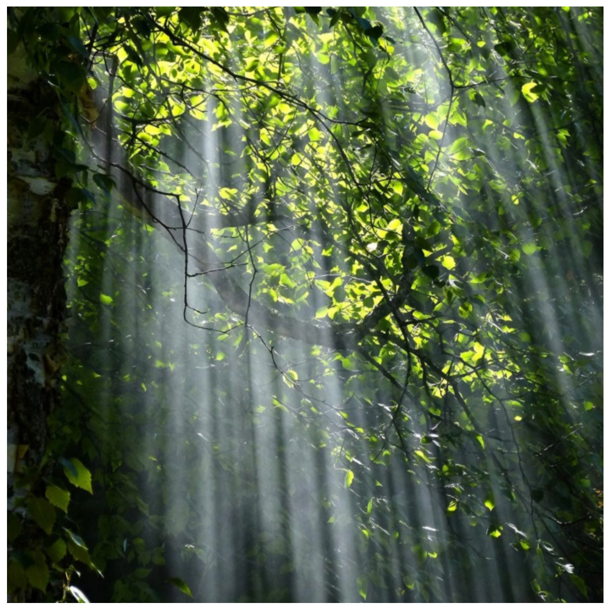

পকেট থেকে কী একটা পড়ে গেছে মাটিতে৷ হলদে পালকটা লিটা কুড়িয়ে নিল লিটা৷ উন্মাদের মতো হাসল একটু৷ মাথায় গঁজল পালকটা৷ মনে হল তার ধমনী বেয়ে চলাচল করতে শুরু করেছে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ৷ ক্রুদ্ধ এক আগুনের গোলা উঠে আসছে তার শিরা উপশিরা দিয়ে৷ লিটা ধীর পায়ে এগিয়ে গেল দু'পা৷ ডাকবাংলোর দেওয়ালে গিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল একবার৷ লিটার পাগলামো দেখে কংক্রিটের দেওয়ালটা বিদ্রপের হাসি হাসল সম্ভবত৷ লিটা পিছিয়ে গেল একটু৷ শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ছুটে এসে আবার ধাক্কা দিল দেওয়ালে৷ আবার পিছিয়ে গিয়ে ফের নতুন উদ্যমে ছুটে এল লিটা৷ ধাক্কা দিতেই থাকল মুহুর্মুহু৷

মারাংবুরু - মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

৫

পার্টির এক হোলটাইমার একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ এনে দিয়েছে বদ্রিকে। এক গ্লাস জলে এক চামচ ওষুধগঁড়ো মিশিয়ে খেলেই দশটা হাতির বল চলে আসে শরীরে। এ হল ভায়াগ্রার বাপ। জিনিসটা খাঁটি। বদ্রির ধীরে ধীরে শরীর জাগতে শুরু করেছে। বদ্রি নিরাবরণ হলেন ধীরে সুস্থে। সোফায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা দ্রৌপদীর দু'কাঁধে হাত রেখে টেনে আনলেন নিজের দিকে। ছিটকে সরে গেল দ্রৌপদী। কী যেন বলল বিড়বিড় করে। আদি অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর মানুষ দ্রৌপদী। তার সংযোগভাষা লিঙ্গয়া ফ্রাংকা। সেই ভাষার বিন্দবিসর্গ

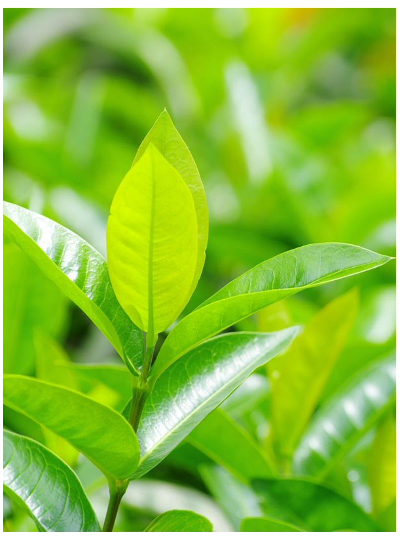

বোঝেন না বদ্রি। বোঝার দরকারটাই বা কী। সম্ভোগের সময় শরীর কথা বললেই তো হল। আয়ুর্বেদিক ওষুধের প্রভাবে তিনি এখন রিপুতাড়িত। নতুন উদ্যমে বদ্রি এগোলেন দ্রৌপদীর দিকে।

দ্রৌপদী নিজেকে আবার ছাড়িয়ে নিল। বিছানা থেকে এক লাফে নেমে ছুট দিল জানলার দিকে। বদ্রির বয়স হচ্ছে। ইঁদুর বেড়াল খেলার দিন আর নেই। বদ্রি একটা কিংসাইজ সিগারেট ধরালেন। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে। নেশা চটকে যাচ্ছে। অ্যাডভান্স টাকা দিয়েছেন তিনি। এখন এত উৎপটাং ঝামেলা কীসের! কালো কষ্টিপাথরে তৈরি যক্ষিণী মূর্তির মতো কালো মেয়েটিকে বদ্রি দেখেন লোলুপ চোখে। তাঁর রক্তের মধ্যে দ্রিমিদ্রিমি ধামসা মাদল বাজে। এই কালোবরন যক্ষিণীর শরীর ভোগ করার বাসনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। দ্রৌপদী স্থির দাঁড়িয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে কী যেন দেখছে। জলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গঁজে বদ্রি এগিয়ে যান দ্রৌপদীর দিকে।

তখনই ডাকবাংলোটা দুলে উঠল একবার। ঈষৎ চমকান বদ্রি শর্মা। ভূমিকম্প হচ্ছে? নাকি চার পেগ হুইস্কির পর আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাওয়াতে প্রেশারটা বেড়েছে? ঘরটা আবার কেঁপে ওঠে। কেমন গুমগুম শব্দ হয়। থরথর করে নড়ে ওঠে ঘরের আসবাব। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ দুটো দেওয়াল থেকে খসে মেঝেতে ছিটকে পড়ে বিকট শব্দ করে। কী হল ঠাহর করার চেষ্টা করতে থাকেন বদ্রি। খোলা চুলের দ্রৌপদীকে উন্মাদিনীর মতো দেখায়। দ্রৌপদী অপ্রক'তিস্থর মতো ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠে। জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু দেখায়। চোখের তারাদুটো জলে অজানা জিঘাংসায়। হিসহিস করে বলে, মারাংবুরু .. মারাংবুরু!

বদ্রি থতমত খান। তিনি কোথাও পড়েছিলেন, মারাংবুরুকে বলা হয় পাহাড়ের দেবতা। মারাং অর্থ বড়, বুরু মানে পাহাড়। শিবের সঙ্গে কানেকশন আছে। বদ্রি সংস্কার-টংস্কার মানেন। তাঁর ধার্মিক পতিব্রতা বউ বাড়িতে প্রত্যেক সোমবার শিবপুজো করে। কৌতূহলী হয়ে পা টিপে টিপে আসেন বদ্রি। দাঁড়ান দ্রৌপদীর পেছনটায়। কাচের ওপাশে তাকাতেই বদ্রির বিময় আকাশ ছোঁয়া।

সমুদ্রপাড়ের হলদে বালির মতো গঁড়ো গঁড়ো হলুদ জ্যোৎস্না বিছিয়ে আছে ডাকবাংলোর হাতায়। সেই

বিল্ডিংটা৷ দ্রৌপদী কখন যেন দরজার ছিটকিনি খুলে ছুটে বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে৷ বদ্রি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন৷ তাঁর পা দুটো কেউ আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে মেঝের সঙ্গে৷ ডাকবাংলোর কর্মচারীরা কি এখনও ঘুমিয়ে আছে? তারা কি কিছুই টের পাচ্ছে না? ডাকবাংলোর কর্মীদের চিৎকার করে ডাকতে গেলেন বদ্রি৷ চোকড হয়ে গেছে স্বর৷ গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না একটুও৷ উন্মত্ত সাপের ফনার মতো গোটা ডাকবাংলোটা দুলতে শুরু করেছে প্রচণ্ডভাবে৷ জানলার কার্নিশটা ধসে পড়ল হুড়মুড় করে৷

প্রমাদ গোনেন বদ্রি৷ তাঁর শেষের সময় কি ঘনিয়ে এল? এই ডাকবাংলো কি ভেঙেচুরে গঁড়িয়ে যাচ্ছে? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে সবকিছু? পম্পেই নগরীর মতো ধংস হয়ে যাচ্ছে এই মফস্বল শহর? গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড৷ শ্বাস নিতে ভুলে গেছেন বদ্রি৷ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন জানলার ওপাশে৷ মাথায় হলদে পালক গোঁজা অতিকায় সেই ছায়ামূর্তির অবয়ব দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে৷ মত্ত হাতির মতো তাঁর দিকে আবার ধেয়ে আসে এক অলৌকিক অতিমানব৷ গলা শুকিয়ে আসছে৷ মাথা কাজ করছে না৷ মৃত্যুভয় জাঁকিয়ে বসছে তাঁর সমস্ত সত্ত্বায়৷ বদ্রি শর্মা ককিয়ে ওঠেন, মারাংবুরু .. মারাংবুরু!

রূপকথা, মুখোসকথা

অহনা বিশ্বাস

সে ছিল এক বড় দুঃখী কন্যা। দুঃখী, কেননা সে বড়ো সুন্দর। সে তা হতে চায়নি মোটেও। কিন্তু বিধাতা তাকে প্রাণমন ভরে সাজিয়েছিলেন। তার ঘরের লোক ভয়ে তাকে কখনও একা বের হতে দিত না। সবসময় সঙ্গে লোকলস্কর। কন্যার ভালো লাগত না। এই অপরূপ কন্যা কি যেমনতেমন ছেলের হাতে পড়বে! পিতামাতা তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপবান পুরুষের হাতে তুলে দিতে চায়। আসলে কন্যার ললাটলিখন ছিল ভারি অদ্ভুত। এক বিখ্যাত গণক শিশুকালে কন্যার কপাল নিরীক্ষণ করে বলেছিল, এ কন্যাকে দত্যি -দানো কারুর মারার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কণ্ঠে অপরাজিতার উল্কি আঁকা কোনও পুরুষ যদি তাকে একবার মাত্র স্পর্শ করে, তাহলে কন্যার আর বিয়ে হবে না। চিরঅনূঢ়া থেকে যাবে সে। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত সামলে রেখো তাকে।

এ কী ভয়ানক কথা! কন্যার বাপমা ভাবে, এমন স্বর্গের পরীর মতো সুন্দর মেয়ের যদি বিয়েই না হল, তাহলে আর জীবনে রইল কী। কত সাধ তাদের ঢাকঢোল বাজিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয়। এমন সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করতে কত না রাজাগজা হাজির হবে। কত গয়না,কত উপঢৌকন পেয়ে মেয়ে একদিন রাজারাণী হবে। এমন কন্যার জন্ম দিয়েছে বলে সবাই বাপমাকে ধন্য ধন্য করবে। কিন্তু সেই গণকের কথা শুনে বাপমা খুব ভয় পেয়ে যায়। সারা রাত বসে তারা শলা করে। মেয়েটি তাদের সোনার পুতুল ঠিকই, কিন্তু একটু ট্যারাবাঁকা। সবসময় তার মর্জি বোঝা দায়। বলা যায় না, কোনও ছেলের গলায় নীল অপরাজিতার উল্কি দেখলে, সে মেয়েই হয়ত নিজে থেকে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরবে।

মেয়েকে সবদিক থেকে আগলে রাখে তারা। অপরাজিতা উল্কির খবর তারা কাউকে জানায় না। এমনকি কন্যেকেও নয়।

কন্যা দেখত, বহু রাজপুত্র , কোটালপুত্র তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কতজন মালা হাতে লোকলস্কর ভেদ করে তার দিকে ছুটে আসতে চায়। কিন্তু ছুটে এলে কী হবে, কন্যার একজন কাউকেও পছন্দ হয় না। এইসব ছেলেদের দেখলে তার ঘুম পায়। ঘরে এসে সোনার পালঙ্কে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার সুন্দর চুলগুলো মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে তখন যেন কাঁদতে থাকে।

বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো চিঠিতে ঘর পাহাড় হয়ে যায়। বাপমা দিন গোনে, বলে একটু সবুর কর বাপু।আর মাত্র কয়েকমাস আছে, মেয়ের ষোলো বছর শেষ হতে। শেষ হলেই স্বয়ংবরের ব্যবস্থা হবে। তবে প্রথমে রূপ -গুণ - টাকাকড়ি দেখে কয়েকজনকে প্রথমে বেছে নেবে বাপমা। তারপর স্বয়ংবরের আয়োজন। নইলে নিজের মেয়ে যে কাকে পছন্দ করবে, তা বলা ভারি মুশকিল। মেয়ের মতিগতির ওপর একেবারে ভরসা নেই বাপমায়ের।

ষোলো বছর শেষ হবার আগের দিন পরম রূপবতী কন্যাকে নিয়ে মাবাপের গরব আদর যেন আর ধরে না। এই সসাগর ধরণীতে কার এ হেন রতনধন আছে। এ দিন তাই অনেক খাওয়া দাওয়া আদর স্ফূর্তি। ষোলো বছরের কিশোরী কন্যাও তখন আনন্দে উতলা। জন্মের পর এই প্রথম সে স্বাধীনতা পাবে। যেমন খুশি সাজবে, যেখানে খুশি যাবে, যা ইচ্ছে তাই করবে। ষোল বছর হবার ঠিক আগের দিন, কন্যা ঝোঁক ধরল, আজ তাকে একবার একা ছাড়তেই হবে। মা বাবা আজ একটু নরম, মেয়েকে আহ্লাদ দিতে পারলে নিজেদেরও স্ফূর্তি কম হয় না। কিন্তু চারপাশে প্রণয়প্রার্থী পুরুষ জমেছে অনেক। হঠাৎ কন্যা যদি অযোগ্য কাউকে পছন্দ করে বসে ,তাহলেও ঝকমারির শেষ নেই। তাদের একজনের সঙ্গেও কন্যার আগে থেকে যোগাযোগ করতে দেওয়া

যাবে না। কিন্তু কন্যা নাছোড়।

অবশেষে কন্যার মা বলল, যেতে দিতে পারি, কিন্তু একটাই শর্ত। তুমি লোকালয়ে যেতে পারবে না। যেতে হবে একমাত্র বাড়ির পিছন দিকের জঙ্গলে। তাও সন্ধ্যার পর। যেখানে জঙ্গল নাকি এত ঘন, সেখানে মানুষ কেন, পশুপাখিও চলাচল করে না।

মা ভেবেছিল, মেয়ে এতে ভয় পাবে। কিন্তু মেয়ে ভয়ডর কিছুই জানে না। সে একপায়ে নাচতে নাচতে গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহে গেল। মাবাপ ভাবলো, যাকগে, মেয়ে তো আর মরছে না আর কোনও পুরুষস্পর্শও হচ্ছে না।

সেই জঙ্গলে থাকত এক অভিশপ্ত রাজকুমার। একদা তার ছিল খুব রূপের গরব। সেই গরবে গুণী- জ্ঞানীসহ দুনিয়ার মানুষকে সে কুৎসিত ভাবত। একদিন এক জরতি ভিখারিনী তাকে অভিশাপ দেয়। মানুষের রূপ বদলে সে অদ্ভুত এক প্রাণী হয়ে যায়, অথচ এই পৃথিবীতে আর একজনও তার মতো দেখতে নেই বলে সে এই অরণ্যে আশ্রয় নেয়। কেউ তাকে সঙ্গ দেয় না। একাকী ভিন্নতর রূপ নিয়ে সে দিনের পর দিন কাটায়। তবে ভিখারিনী তাকে এও বলে, যদি কোনওদিন এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী এসে তোমাকে স্পর্শ করে, তবেই তুমি আগের রূপ ফিরে পাবে। নইলে এযাবৎ তোমার নির্বাসন।

কুমার ভাবে, হায় ,তার এই বিচিত্র রূপ কোন অপরূপা পছন্দ করবে, কেনই বা করবে? তার দিকে যেখানে কোনও মাংসাশী প্রাণীও মুখ তুলে চায় না, সেখানে কি কখনও কোনও অপরূপা কন্যা কেউ আসতে পারে!

কিন্তু সেই কন্যা এল। চাঁদের আলোয় তখন চারদিকে রুপোরঙের বন্যা। কন্যা দেখল সবুজ রঙের আশ্চর্য শ্যাওলা মেখে কে যেন ঘুমিয়ে আছে। কাছে এসে দেখল, গায়ে তার হলুদ করবীর আলপনা। বুকে তার শঙ্খ চলার দাগ। ঠোঁটে তার কুঁচফলের বিভা। চুলে তার গোলঞ্চ পাতা আর গলাতে আঁকা একটা নীল সদ্যোজাত অপরাজিতা।

কন্যা সেই অভিশপ্ত নীলকণ্ঠ কুমারের রূপে পাগল হয়ে গেল। এমন রূপ সে কখনও দেখেনি, আর কাউকে দেখে প্রেমে এমন পাগলও হয়নি। কন্যা তার হাত স্পর্শ করে তাকে জাগ্রত করল। তার গলায় পরিয়ে দিল জোনাকির মালা।

রাজকুমার সেই অপরূপাকে পেয়ে ধন্য হল। সারারাত ধরে চলল তাদের পাগলকরা উথালপাতাল এলোমেলো কথোপকথন। রাজকুমারের প্রতিটি অঙ্গ স্পর্শ করে কন্যা দখিনাহাওয়ায় দোলা শিরিষ ফুলের মতো শিহরিত হল। কুমারের কণ্ঠের নীল অপরাজিতা চুম্বন করে কন্যা বলল, রাত পোহালেই আমার ষোলো বছর পূর্ণ হবে। এদিন আমার বাবামা আমার স্বয়ংবরের আয়োজন করবে। তুমি আসবে তো আমাকে বিয়ে করতে?

কুমার বলল, আসবো আসবো। এই ধরণীতে আমার মতো ভাগ্যবান আর কে আছে। তুমি আমার নতুনজন্ম দিয়েছো। তুমি যে আমার ঈশ্বরী। তোমাকে মাথায় রেখে আমি বাকি জীবন তুমুল কাটাবো কন্যা। পুরনো যা কিছু, সব আমি ভুলে যাবো।

ভোরের আলো ফোটার আগেই কন্যা ঘরে ফিরল। তার মা বাবা তার মধ্যেই আমপাতা আর কদম ফুল দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে গোটা বাড়ি। সানাই এ কলাবতীর সুর ধরেছে ওস্তাদ। আয়না আর পুঁতির কাজ করা চাদোয়ার নীচে গদিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে সারা পৃথিবীর সেরা সেরা ধনী রাজপুত্ররা। তাদের সামনে হীরামোতির পুঁটলি। যাকে কন্যা বরণ করবে, সে এইসব মণিমুক্তা দিয়ে যাবে কন্যার বাপমাকে।

কন্যা জানলার ফাঁক থেকে কদাকার লোকগুলোকে দেখে আর হাসে। মনে মনে বলে, আসুক না আমার সেই পুরুষ, তোমাদের একেবারে হারিয়ে ভূত করে দেবে। এই পৃথিবীতে তার মতো সুদর্শন আর কী একজনও আছে, যে তার মালা গ্রহণের যোগ্য!

কন্যা এদিন রক্তবর্ণ বেনারসিতে, মাথায় জুঁই ফুলের

মালাতে একেবারে স্বর্গের অপ্সরী হয়ে হঠেছে। তারপর কলাপাতার রেকাবিতে লাল পারিজাতের মালা হাতে সে ঝমঝম মল বাজিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু তার সেই কুমার কই! চারিদিকে কন্যের অপছন্দের পুরুষেরা চোখের খিদে, মনের খিদে নিয়ে তার দিকে দুহাত মেলে নানা ভঙ্গিতে ডাকাডাকি করছে। তারা তা করুক। কিন্তু সে কই। সে কি বোঝেনি , কন্যা তাকে কত ভালোবেসেছে! মিলন অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে আসার যন্ত্রণা কি সে চেনে না!

কন্যার কান্না পেল। তার চোখ বেয়ে যখন একটা মুক্তো পড়বো পড়বো বলে আয়োজন করছে, তখন এক রাজার কুমার ফিসফিস করে বলল, কন্যা এই যে আমি। কাল অরণ্যের গভীর অন্ধকারে তুমি যার গলায় জোনাকির মালা পরিয়েছিলে। আমিই সেই শাপমুক্ত রাজপুত্র।

রাজকন্যা তাকে খানিক দেখলে। একি সেই! এ তো অন্যদের মতোই একজন সাধারণ পুরুষ।

কন্যার বাপমা বলল, ভুল করিস না মেয়ে। এই রাজাই এ তল্লাটের সবচেয়ে বড়ো রাজা। এ সঙ্গে এনেছে অগুনতি মোহর ভরা কলসি। এ তো বলছে , কাল রাতে একেই তুই পছন্দ করেছিলি।

রাজকন্যা জলভরা চোখে তার দিকে একবার তাকালো। তারপর 'আমাকে ঠেকিয়েছে ঠকিয়েছে 'বলে কাঁদতে কাঁদতে সে মঞ্চ ছেড়ে বের হয়ে এসে সে নিজের বিছানাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলে।

তার গয়না পরা হাত কাঁদল,নূপুর পরা পা কাঁদল, রক্তবরণ বেনারসি কাঁদতে কাঁদতে এলোমেলো হয়ে গেল, জুঁইএর মালা পরা কন্যার মেঘের মতো চুল প্রবল ব্যথার বৃষ্টিতে ভেসে গেল।

কন্যার বাবামা মাথায় করাঘাত করতে লাগল। রাজপুত্র এসে বলল, কন্যা, তুমি কি আমায় শেষে চিনতে পারলে না।

কন্যা বলল, পেরেছি। তোমার গলার স্বর তোমাকে চিনিয়েছে।

কুমার বলল, তবে এসো। আমি যে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

কন্যা বলল, যাব। যদি তুমি তোমার সেই মুখোস পরে ,সেই বেশে আমার কাছে আসো।

মুখোস! সে আমি আর কোথায় পাবো কন্যে। তোমার প্রেমের স্পর্শেই যে তা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেছে।

কন্যা বলল, হায় কুমার, আমি যে তাকেই ভালোবেসেছিলাম। তুমি যে তখন তাকেই দেখিয়েছিলে। বাকি তুমি তো সামান্য একটা লোক। তোমাতে আমার চলবে না। মুখোস নিয়ে এসো কুমার।আমাকে বাঁচাও।

মুখ নিচু করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী সেই কুমার ফিরে যায়। হায় আজ সে কত গরীব। আজ তার সব অহংকার গেছে। আজ সে কোনও নোংরা জরতি ভিখারিনীকেও দেখতে পায় না, যে তাকে আশীর্বাদ কি অভিশাপ দিয়ে তার পুরনো রূপ ফিরে দেবে।

মালার জোনাকিরা কুমারের গলা থেকে ছিঁড়ে চরাচরে উড়ে হারিয়ে যায়। কেবল আধখানা মিলনের বেদনার মতো আধখানা চাঁদ নীল আকাশের বিছানায় এককোণে পড়ে থাকে। বোধহয় কখনও কখনও সে কাঁদে।

আমার কথাটি ফুরালো।

নটে গাছটি মুড়ালো।।

আমাদের

অবনী ভাল নেই

অসিত বরণ সাহা

(এই লক-ডাউনে "অবনী ভাল আছো?" র কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা)

চারিদিকে সব বন্ধ দোকানপাট,
ঘরের ভেতর লুকিয়ে বসে থাকা -
থমকে আছে শূন্য রাস্তা ঘাট,
চেষ্টা শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

অলস দিনের মৃত্যুভয়ের ঘরে
লক ডাউনের শিকল দিয়েছি তুলে -
চেনা কেউ ডাকছে না নাম ধরে
তারিখ বারের হিসেব গিয়েছি ভুলে।

কবিতা এখন আকাশ পানে চেয়ে,
বন্ধ এখন চাঁদের আনাগোনা ।
কি বিভীষিকায় বিশ্ব গিয়েছে ছেয়ে -
প্রতিদিন শুধু বেদনার দিন গোনা।

সমস্ত পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে রাতে,
আতঙ্কে বিশ্ব হারিয়ে ফেলেছে খেই -
স্যানিটাইজার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি হাতে,
"শক্তিদা ভেতরে এসো, অবনী ভাল নেই" ।

মরতেই হবে ব্যাধিতে কিংবা ভাতে,
অলস বসে, রুজিটা গিয়েছে খোয়া -
এ যুদ্ধ কি জেতা যাবে কোনোভাবে?
অবনী এখন বাড়িতে আছো শোয়া!

করোনা-গৃহবন্দীর পথচাওয়া

অনিল চক্রবর্তী

কয়েক বছর অন্তর শীতকালে কলকাতায় এসে দু তিন মাস বেশ হৈ হৈ করে কাটিয়ে আমেরিকার চিরাচরিত জীবনে ফিরে যাওয়া আমাদের প্রায় রুটিন হয়ে গিয়েছিল। এবারে ছিল তার ব্যতিক্রম। নিতান্ত বৈষয়িক একটা ব্যাপারের ফয়সালা করতে মাত্র চার সপ্তাহ থাকার প্ল্যান করে কলকাতায় এলাম ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে। Man proposes, God disposes এই আপ্তব্যাক্যটা যে আমাদের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। কাজের কাজ তো হোলোই না, এক অভূতপূর্ব অনাসৃষ্টিকারী মারণ ভাইরাস আচমকা এখানে উদয় হয়ে আমাদের জীবনযাত্রার ওলোটপালট করে দিল দারুন ক্ষিপ্রতায়। তার কি দাপট! যত দূর জানা যায়, চীনে ২০২০ সালের প্রথম দিকে জন্ম নিয়ে এক লাফে পর্বত সমুদ্র পার হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এক দু মাসের মধ্যে। নতুন এই ভাইরাসটির গতি প্রকৃতি বোঝার আগেই এটা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ লোককে সংক্রমিত করে ও হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটায়। বিজ্ঞানী মহল জানতেন, এর প্রতিষেধক বার করতে হলে প্রথমেই এর চেহারাটা জানা দরকার। কিছুদিনের মধ্যেই এই অতিমারি ভাইরাসের রূপটা ধরা পড়ে এবং তাঁরা এর নামকরণ করেন, Corona Virus Disease of 2019 - Covid 19, সংক্ষেপে Corona। কিন্তু পৃথিবীর নামী অনামী অসংখ্য গবেষক ও ল্যাবরেটরির প্রায় আট মাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, একে বশ করে, এর সংক্রমনের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার কোন কার্যকরী ওষুধ বা ভ্যাকসিন এখনও অধরা রয়ে গেছে। তবে বাড়ির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে ও বাইরে বেড়োলে পরস্পরের মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে নাক, মুখ ঢাকা মাস্ক পড়ে চললে এর দুর্বার গতিকে যে কিছুটা কমানো যায় সে ব্যাপারে সবাই একমত। ফলত, অসুখ প্রতিরোধের তালিকায় দুটো শব্দের সঙ্গে নতুন পরিচয় হল – lockdown ও self-isolation – দুটোরই উদ্দেশ্য মানুষ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা। প্রথমটি, সরকারের হুকুম চাপিয়ে দেওয়া - নির্দ্দিষ্ট দিনে বেশীর ভাগ দোকান বাজার ও গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখার বাধ্যবাধকতা আর দ্বিতীয়টা অনেকটা স্বেচ্ছানির্বাসন।

এই যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে আমাদের ফেরার দিন পিছিয়ে গেল অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য। সেই দীর্ঘ সময়ে আমরা নিজেদের আটকে রেখেছি আমাদেরই তিনতলা একটা বাড়িতে। এর চার দেওয়ালের মধ্যে, চেনা এক গানের ভাষায়, নানান দৃশ্যকে সাজিয়ে নিয়ে বাহির বিশ্বকে দেখায় আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বাড়িটার

এক বিশেষ আকর্ষণ, ঠিক রাস্তার ওপরেই চারিদিকে গ্রিল ও জাল দিয়ে ঘেরা দোতলার এক চিলতে এক বারান্দা। তাপ ও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য দড়ি-টানা তিনটে ব্লাইণ্ড আছে, যেগুলো উঠিয়ে দিয়ে বারান্দার এক কোণে রাখা এক চেয়ারে বসে ডাকঘর উপন্যাসের অমলের মত নীচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে

করোনা-গৃহবন্দীর পথচাওয়া - অনিল চক্রবর্তী

দিনের অনেক ক্ষণ আমার কেটে যায়। শুরু হয় সকালের চা বিস্কুট সহযোগে দুটি দৈনিক কাগজ পড়া দিয়ে আর পাড়ার বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে ওপরের এক চিলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে। সত্যি বলতে কি,কলকাতার আকাশ এত ঝকঝকে পরিষ্কার কতদিন দেখি নি, লকডাউনের দৌলতে এক টানা এতদিন গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখার প্রত্যক্ষ পুরস্কার আর কি! আবার এই আকাশের বুকেই দেখেছি কালবৈশাখীর ঘন কালো মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের খেলা আর আষাঢ় শ্রাবণ মাসের ঝর ঝর ঝরিছে বাদল ধারা। এছাড়া আছে সারা দিন ধরে কত জানা-অজানা পাখীর চকিত আনা গোনা। এক একটা পাখীর এক এক রকম আওয়াজ, সব মিলিয়ে এক কলতান! তার মধ্যে দিনে কমপক্ষে তিনবার বোধহয় এক বিরহী কোকিলের মিষ্টি কুহুতান। এই বারান্দা ছাড়া এই বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেই পারি না।

এই বাড়িটার সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেটা খুব চওড়া নয়, তবে দুটো গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে; দু প্রান্তের আড়াআড়ি চলা দুটো রাস্তা এর দৈর্ঘটাকেও বেশ সীমিত করে দিয়েছে। দেখার মত যানবাহন বা লোক চলাচলের বাহুল্য একেবারেই নেই। রাস্তার দুপাশেই সার সার চার-তলা বাড়ি,অনেকগূলোই লোকশূন্যতায় হাহাকার করছে! তাও তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের একসময়ের জমজমাট দিনের কথা ভাবতে ভাল লাগে। বাড়ির সামনের দেওয়াল আর আগাপাস্তলা পীচ ঢালা রাস্তার মাঝখানে এক টুকরো একটা জমি কোনভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। আর এই অপরিসর জায়গাটাতেই টগর, বেল, চাঁপা, পাতাবাহার ইত্যাদি নানারকমের গাছ ঠেসাঠেসি করে উঠেছে। এই কয় মাসে এক একটা ফুলগাছ এক এক রকমের ফুলের ডালা সাজিয়ে আমার মন টেনেছে! তার মধ্যেই হংস মধ্যে বক যথার মত, সব গাছ ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় কলাগাছ। আমার হাতে নিরবিচ্ছিন্ন সময়। দিনের পর দিন দেখছি কলা গাছটার নতুন একটা পাতা গজানোর খেলা। অনেকগুলো লম্বা লম্বা কিছুটা জীর্ণ গাঢ় সবুজ পাতার মাঝে হটাৎ একদিন দেখি হাল্কা সবুজ রঙের গোটানো পর্দার মত একটা পাতা বেরিয়ে এল ঠিক গাছের মাঝখান থেকে। তার পরে বেশ কয়েকদিন ধরে চলল সেই পর্দা খোলার কাজ - পাতার ওপর থেকে নীচে, আস্তে আস্তে, দিনে দিনে। তারপর যখন সবটা খুলে গেল, তখনও সে অন্য পাতাদের থেকে একটু ভিন্ন। পাতার ধারগুলো বেশ মসৃণ, রংটাও হাল্কা সবুজ। মাত্র কয়েক দিনের জন্য।

তারপর আস্তে আস্তে পাতার ধার গুলো একটু একটু করে জীর্ণ ও মলিন হতে লাগলো, রংটাও গাঢ় সবুজ - ঠিক অন্য পাতাদের মত। মনে হয় গাছটাই তাকে বুঝিয়ে দিল, তোমার বয়স হয়েছে, আর সেই নবীন রূপ ধরে রাখতে পারবে না। চোখের সামনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরের বিবর্ত্তনের প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পেলাম। বাতাসের তালে তালে পাতাগুলো যখন হিন্দোলিত হয়, মনে হয় যেন ওরা কার সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছে। কি সুন্দর লাগে দেখতে!

আমাদের সামনের রাস্তাটা বাঁ দিকে শেষ হওয়ার আগে একটা সরু গলি বেরিয়ে গেছে। গলি জুড়ে একটা বড় ফ্যাক্টরীর বিশাল দেওয়াল, যেন পর পর ওঠা বাড়ির একঘেয়েমির হাত থেকে চোখের একটু নিস্তারের জন্য।

করোনা-গৃহবন্দীর পথচাওয়া - অনিল চক্রবর্তী

বহু বছর ধরে দেখেছি এই গলিটা ছিল পথচারীদের প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মুক্তাঞ্চল - দুর্গন্ধের প্রকোপে ওর পাশ দিয়ে হাঁটাই ছিল দুষ্কর। বেশ কয়েক বছর আগে মনে হল দুর্গন্ধটা ফ্যাক্টরীর কর্তৃপক্ষের নাসিকার মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে! একদিন দেখলাম বেশ কিছু শিল্পী মিলে সারা দেওয়াল উজ্জ্বল রঙে আঁকা নানা দেব দেবীর ছবি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। রাতারাতি দেওয়ালের ভোল পাল্টে গেল। খটখটে শুকনো, দৃষ্টি-মনোহর চেহারা দেখে তাকে আর চিনতেই পারা যায় না। যতই হোক, ঠাকুর দেবতা বলে কথা! তাদের তো অসম্মান করা যায় না! তাতে তো পাপ হবে, তাই না? ঠাকুর দেবতাদের প্রতি সাধারণের ভক্তিছেদ্দা এখনো আছে জেনে ভাল লাগল।

কলকাতায় এলেই এই বাড়িটায় এসে থাকছি, তা প্রায় চল্লিশ বছরের বেশি হয়ে গেল। তখন থেকেই দেখছি একটা বিহারী লোক ওই গলিটার মোড়ের ফ্যাক্টরীর দেওয়াল থেকে টানা একটা প্লাস্টিকের ছাউনীর তলায় কয়লা-জ্বালানো উনুন, ছোট টেবিল ও একটা ইস্ত্রী নিয়ে বেশ একটা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এখনও দেখছি কাপড় জামা ইস্ত্রী করিয়ে নেওয়ার সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। এখন হয়ত সেই বিহারী লোকটার নাতিরা ব্যবসা চালাচ্ছে। কিন্তু সেই প্লাস্টিকের ছাউনী, সেই কয়লা-জ্বালানো উনুন আর সেই ইস্ত্রীর কোনো বিবর্তন এখনো হয়নি।

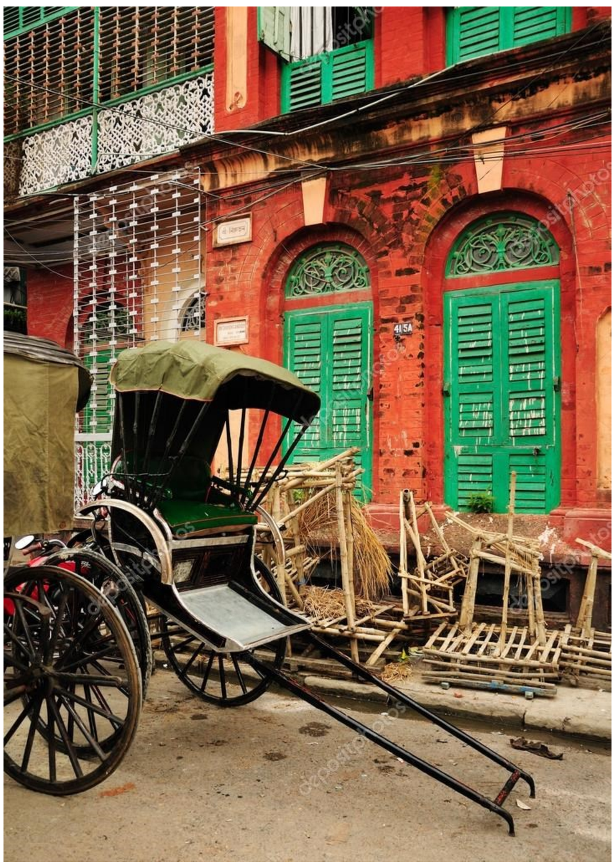

এই বাড়ির ঠিক উল্টো দিকের চারতলা বাড়ি দুটো মহা জনশূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে আজ বহু কাল ধরে। শুধু একটার এক তলায় বিজু বলে একটা দারোয়ানকে চোখের সামনে বুড়ো হয়ে যেতে দেখলাম। দিনের একটা বড় সময় সে হয় বাড়ির সামনে একা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, আশেপাশের বাড়ির ফাইফরমাশ খাটে, সকালবেলায় আসা সব্জিঅলার সঙ্গে গল্প করে অথবা রাস্তার ডানদিকের মোড়ে বন্ধ সোনার দোকানের রাস্তা থেকে ওঠা সিঁড়িটায় পাড়ার আরও দু-চার জন নিষ্কর্মার সঙ্গে বসে আড্ডা মারে। দেখে মনে হয়, ও খোশ মেজাজেই আছে। হাতে কোনও কাজ না থাকলেও নিজেকে কি করে ব্যস্ত রাখা যায়, বিজু তার এক অনুকরণীয় উদাহরণ। হয়ত দারোয়ানদের এই রকম মনোবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে। আমরা এই কয়েক মাসের ঘরবন্দী থাকতেই হাঁপিয়ে উঠেছি - ওর মত ধৈর্যের অভাবের জন্যই হয়ত!

পৃথিবী জোড়া করোনা সংক্রমনের বিস্তারিত খবর প্রতিদিনের কাগজ ভরে থাকলেও মার্চ মাসের প্রথম দিকে আমাদের দেশের বিশেষ উল্লেখ থাকতো না। কিন্তু মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে সেই যে ক্ষীণ ধারায় শুরু হল, তা এখন বন্যাধারার আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। এই মাসের শেষ সপ্তাহ শুরু হল এক সপ্তাহের লকডাউন ও গৃহবন্দীর ফরমান দিয়ে। অতিমারিকে হারাতে গেলে এ ছাড়াও মাস্কের ব্যবহার ও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ উপদেশ তো ছিলই।

করোনা-গৃহবন্দীর পথচাওয়া - অনিল চক্রবর্তী

সরকারের তরফে সংক্রমণ প্রবণ-এলাকা গুলোকে জীবানুমুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলাম এই বারান্দায় বসেই। একদিন দেখলাম এই সরু রাস্তার অনুপযোগী এক বিশাল ট্যাঙ্কার ঢুকছে আশেপাশের সব বাড়ি স্প্রে করতে। তার আগে আগে চলছে এক অটো, লাউডস্পিকারে জানলা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে থাকার সতর্ক বানী দিতে দিতে। এই ক মাসের মধ্যে আরও একবার এইরকম স্প্রে করতে দেখেছি। ওই প্রতিষেধক ছড়িয়ে যাওয়ার পর তীব্র গন্ধে বেশ কয়েক ঘন্টা বারান্দায় বসা ছিল অসম্ভব।

এই প্রথম গৃহবন্দী থাকার অভিজ্ঞতা। বাড়ির বাইরে পা না ফেলে, দিনের পর দিন কাগজ বই পড়ে, টিভি দেখে, বাড়ির ভেতরেই হাঁটাচলা করে সময় কাটানো - সময়ের ওপর এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ঘড়ির কাঁটা যেন স্থির হয়ে আছে। টিভির দৌলতে সন্ধেবেলার কয়েকটা সিরিয়াল দেখা এখন অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সকালের কাগজ পড়া কয়েক ঘন্টার মুক্তি দেয় ঠিকই, কিন্তু তার পরেই মনে হয় সন্ধে আসতে এত দেরী করছে কেন! মাঝে মাঝেই ঘরের বাইরে পদক্ষেপ করে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়োনোর স্বাধীনতা আমাদের জীবনে যে কত জরুরী তা এর আগে কোন দিন বুঝি নি। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় পৃথিবীর পরিমণ্ডলের অনেক ওপরে একটা ছোট স্পেশশিপের ততোধিক ছোট পরিসরে থেকে যে সব এস্ট্রোনট বিপুল গতিতে দিনের পর দিন পৃথিবী বেষ্টন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক তোড়জোড় না করে এক পলকের জন্যও যাদের দরজার বাইরে এক পা বাড়ানো অসম্ভব, তারা কি অতিমানব! আমাদের এই একঘেয়েমির বিপন্নতা তাদেরও কি অস্থির করে তোলে! কিছুদিন বাদে আমার একটা উপলব্ধি হল; আমাদের সবারই একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে - আস্তে আস্তে সব কিছু সয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। আমরা নিজেরাই এই মন খারাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজে বার করি। এত দিন পরে এখন যেমন নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সময় তো মন্দ কাটছে না। কেমন সময়টাকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছি এক এক কাজের জন্য। সময়ধারা তো এত অলস নয়। সব কিছুকে মানিয়ে নেওয়ার আমার যে এত ক্ষমতা ছিল তা তো আগে জানতামই না!

নিভিতে দিও না

গৌতম দত্ত

হাত থেকে খসে গেছে সমস্ত পতাকা
মাথার ওপরে শুধু মৃতদেহ ভার
অদ্ভুত সময় এলো চোখে নেই একফোঁটা অশ্রু
দেখেছ আলোর শিখা কাঁপা কাঁপা দোলে
কাঁপুক, বিশ্বাস করো তবু আলো আছে
অন্ধকার, এলোডশেডিং, ভয় সব ক্ষনস্থায়ী
ওই কাঁপা আলো তুমি নিভিতে দিও না
অন্ধকারই- সব সত্যি নয়
নরকতো যেরকম নয় বরাভয়
সত্যের আলোকে তুমি নিভিতে দিও না
যতই মাথার ‘পরে জমা হোক মৃতদেহ ভার ।
তুমি নিভিতে দিও না
নিভিতে দিও না।
দিও না।

The Best of Greece

Kiriti Gupta

I came to know much about Greece from history class during my years in High School. I learned about the great philosophers such as Socrates, Aristotle, and Plato. Of course, who can forget the story of Alexander the Great? Greece is the birthplace of Western civilization. It is situated on the southern tip of the Balkan Peninsula; Greece is located at the crossroads of Europe, Asia, and Africa. I always wanted to visit Greece one day to experience the wonder that I only read about in books. So finally, in August of 2019, I was able to make what was once just a wish, become a reality.

There are so many tour choices to review when considering such a massive undertaking. We wanted to see as much as possible while in Greece, so we decided on Cosmos Tours to cover the land tour and island tour by ourselves. Cosmos is one of our favorite and reliable touring companies. This is the fourth time we used the company to travel places around Europe, and I must say they make the travel experience comfortable with good hotels, knowledgeable tour directors, and a tourist bus with a very experienced driver.

Acropolis by Night

We started our journey from Atlanta to Athens via New York. In Athens, we visited the Acropolis. The Acropolis of Athens sits on a rocky hill and is a symbol of the wealth and power of Athens at its height. It contains the remains of several ancient buildings including the most famous Parthenon. The Parthenon is dedicated to the goddess Athena. Some nearby sites we visited were: The Temple of Zeus, Acropolis museum, the first Olympic Stadium, and the main shopping district known as Plaka district where one will find shops supplying everything from souvenirs, clothing, and not to forget, the delicious Greek food. Strolling along the Plaka District is very enjoyable as one gets to see real Greek people and experience their hospitality. Communication is not a problem because everybody understands and tries to speak English. During our stay, we also took a night-time tour of Athens to see the cultural side of Greece, and it gives a completely different perspective of the city that is well worth the tour.

First Olympic Stadium (1896)

From the mainland, we crossed the Corinth Canal and entered the Peloponnese peninsula to head to the coast of Nauplia. From Nauplia, we travelled into Argolis to stop in Epidaurus, located in the hilly countryside with pine trees and oleanders. In this magnificent setting, we saw the ancient OpenAir Theatre that can still seat 14,000 spectators with marvellous acoustics and view.

Like Italy, Greece is known for its historical significance and has some of the world's most fascinating archaeological sites. We took the opportunity to visit some of them in Sparta, which was our next stop.

The Best of Greece - Kiriti Gupta

From Sparta, we travelled to Olympia where the athletes of antiquity performed in honor of the king of deities. We learned more about the history of the Olympic Games and saw the real place where the Olympic torch is first lit and carried to the Olympic Games destination. That was quite a monumental experience.

Following Olympia, we crossed the spectacular Rion-Antirion Bridge, which links the Peloponnese peninsula to the Greek mainland. Our next destination was Delphi, which was once called the "Navel of the Earth." The most interesting to note about Delphi is that it was the greatest oracle of the ancient world where people flocked to seek advice.

We continued our journey to Kalambaka to see Meteora, a cluster of spectacular Christian Orthodox Monasteries perched on a set of rising rock formation. We learned they were originally built by hermit monks living in caves carved into the rocks. Our land tour ended in Athens after an incredible journey through some of the breath-taking highlights of Greek history, culture, architecture, and cuisine.

Santorini by Day

Our island tour started with a one-day visit to three Greek islands of Hydra, Poros & Aegina. The following day we travelled by Blue Star ferries to the volcanic island of Santorini. We were spellbound by the island's natural beauty, as well as picturesque buildings in white built along the slopes. The view of the sunset from the top of the hill was awesome. After spending three days here, we headed toward the biggest island of Crete by using the high-speed jet ferry. We spent a couple of days in Crete in a hotel just facing the Aegean Sea. The island is mountainous; we took a tour to Mount Ida, Crete's highest

Santorini by Night

point. The next day, we took the overnight ferry back to Athens. We booked a cabin on the ferry, which made our journey comfortable. After spending a few more days in Athens to see the remaining sightseeing places and do some last-minute shopping, we headed for our home in Atlanta, Georgia, in the USA.

The duration of our tour was twenty-one days. My expectations and reality were completely different. I had no idea that we would have the best time of our lives in Greece. We have relieved those wonderful memories since returning, and I would highly recommend visiting Greece to anyone who wants a unique adventure covering history, culture, architecture, and cuisine.

বিপথে

অশোক গাঙ্গুলী

আলো আর অন্ধকার,
এ দুটোর মধ্যে কেন জানি না বারবার
যেতে হয় ওই অন্ধকারে,
যেখানে লুকিয়ে থাকে
অজস্র বিষাক্ত নিঃশ্বাস চুপিসারে
আর ঝুড়ি ঝুড়ি সমাজের পাপ,
অজগর ময়াল, কাল-কেউটে সাপ।

সৃষ্টির নেশায়
আমি মাতাল
তাই, ছুটে যেতে চাই
স্বর্গ থেকে পাতাল,
বাস্তব অভিজ্ঞতার আশায়।
কিন্তু যতবারই যেতে চাই স্বর্গের দিকে
জানি না কার অদৃশ্য বিধানে
পথ হারিয়ে ছিটকে পড়ি নোংরা নরকের
এক তমসাময় কোণে।

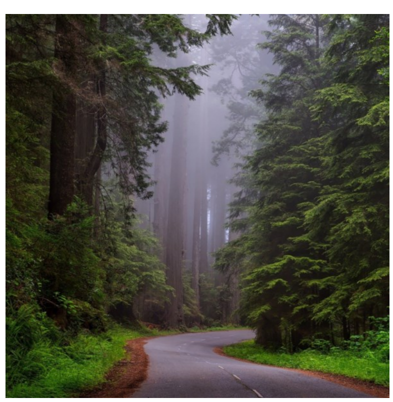

রোদন ভরা এ বসন্ত

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

রোদন ভরা এ বসন্ত
কোনোদিন দেখি নি তো আগে -
মরণ কি জীবন্ত এতো;
বাজে বীণ বিষাদে বেহাগে?

দেশে দেশে হাহাকার ওঠে,
নিরাশার শুনি দীর্ঘশ্বাস,
প্রাণ ভয়ে, অর্থাভাব ভয়ে,
চারিদিকে দুষিছে বাতাস!

শিশু, বৃদ্ধ কেউ নেই বাকি,
গৃহবন্দী, অসহায় মন -
অজানা আশঙ্কা যেন আজ
বেড়া দিয়ে ঘেরে চারকোন!

ঋতুরাজ, হে বসন্ত শোনো,
তুমি তো প্রাণের দূত জানি -
তোমার পরশে নেই কোনো
মৃত্যুভয়, আশঙ্কার বাণী!

শয়ে শয়ে কিশলয় আসে
প্রাণের পতাকা নিয়ে হাতে -
ওদের মিছিল বলে ডেকে,
ভয় নেই; আয় তোরা সাথে!

তোমার রাজত্বে তবে কেন,
হবে আজ এত অঘটন?
দাও বর, হে মহান -
অভিশাপ হোক সমাপন!

কোরো না ভয়

কোরো না ভয়, কোরো না ভয়
এ দুর্দিন হবে যে ক্ষয় -
রয়ো সতর্ক
নবীন অর্ক
পুবের আকাশে হবে উদয়।

কোরো না ভয়, কোরো না ভয়
পার হয়ে যাবে অনিশ্চয়,
আগামী দিন
লাগামহীন
মুখোশ-বিন অসংশয়।

কোরো না ভয়, কোরো না ভয়
মনে থাকে যেন ত্যাগ-প্রত্যয়,
বর্ষা-শীত
হবে অতীত,
রেখো হে ভরসা ভরে হৃদয়।

কোরো না ভয়, কোরো না ভয়
এ অন্ধকার হবে যে ক্ষয় -
আরো নিশ্বাস,
আরো বিশ্বাস,
দিও আশ্বাস, হে দয়াময়!
কোরো না ভয়, কোরো না ভয়।

My Sixth Sense

Ranen Chatterjee

Out of many, I am sharing two paranormal experiences with our readers, which have no possible explanation.

Delaware River Fishing

Every Spring I would be eagerly waiting for a call from my co-worker Joe. Joe, son of a Swedish immigrant couple in Long Island, retired from the US Army a few years earlier. As such, he spent a significant amount of time fishing. I was Joe's fishing buddy for fifteen years. Over the years, we did both saltwater and freshwater fishing. There was another reason for Joe's interest in fishing. Joe had hearing problems; and fishing requires good eyesight and sense of feel rather than any special hearing.

One evening in late April of 2001, I got a call from Joe. He wanted to pick me up at 3:00 AM next morning for fishing in the Delaware River near Port Jervis, NY. Like any other trip, Joe showed up right at 3:00 AM. It took us about 40 minutes to reach the river. Joe parked his car, and we started walking to the river bank on the dark and foggy morning. We both had wader so that we could cast out lines from knee-deep river water. After about half an hour of fishing, we decided to have a cup of coffee. So we came back up to the car and drove around to locate a restaurant knowing fully well that finding a coffee shop this early in the morning would be difficult. Soon we found a small restaurant next to a cemetery. The cashier at the desk took the order. I looked around as we waited for coffee. There were about eight tables. Most of them were occupied by elderly couples silently eating breakfast. I watched them eating breakfast without any sound. No sound from spoon, fork or knife. Also I smelled old cheese

all around us.

After finishing our coffee, we left the money with tips on the table and came outside where our car was parked. There were no other cars parked. This place was on a hilltop, and there were no homes visible nearby. "How did the other guests in the coffee shop manage to come," I asked myself? I looked over the graveyard next door for a possible explanation. Who were these people and where did they come from? I asked Joe if he noticed the same. He kept silent, possibly because he was hard of hearing. Joe passed away a few months after this incident.

My Sixth Sense - Ranen Chatterjee

Holiday Inn at Ft. Patterson Airbase:

It was the evening before Columbus Day. The air had cooled down a lot. Tired and exhausted from air travel, I arrived at the Holiday Inn right next to Ft. Patterson Airbase. The desk clerk politely informed me that the hotel was full, and I must look for a vacancy elsewhere. After lots of persuasion, he agreed to provide a room located at the far corner of the hotel complex that was used by the hotel employee. I had no other choice but to accept the offer since the Airbase BOQ was not available in such a short notice.

After a quick dinner, I went to bed and fell deeply asleep. It was way past midnight when a strange sound broke my sleep. I listened to the sound intensely. Someone was walking in my room! I could hear the sound of every step from the far corner of the room to my bed, which would intermittently stop for a few minutes. This walk cycle kept repeating again and again. I could not see anything since it was dark. “It must be a hot water heater,” I consoled myself. I lived in the North and was used to this type of sound from the water heater in the room. Suddenly, it came to my mind that it was Florida. Room heaters are not used in Florida! Finally I gathered enough courage to sit up on my bed and turn the light on. The room was empty, and I couldn't hear any sound of walking any more. Nor could I find any hot water line! I looked at the table clock next to my bed. It was 3:00 AM. The room was unusually hot at this time of the year. I could not go to bed anymore.

The next morning, I checked out from the hotel to find another hotel. Before I left, I shared my experience of the strange noise with the desk clerk. He looked at me curiously and smiled. Later, I learned from folks in the Airforce base that there was a shooting in the hotel a few years back leading to a death. Could it be the unhappy soul that was still living in the room?

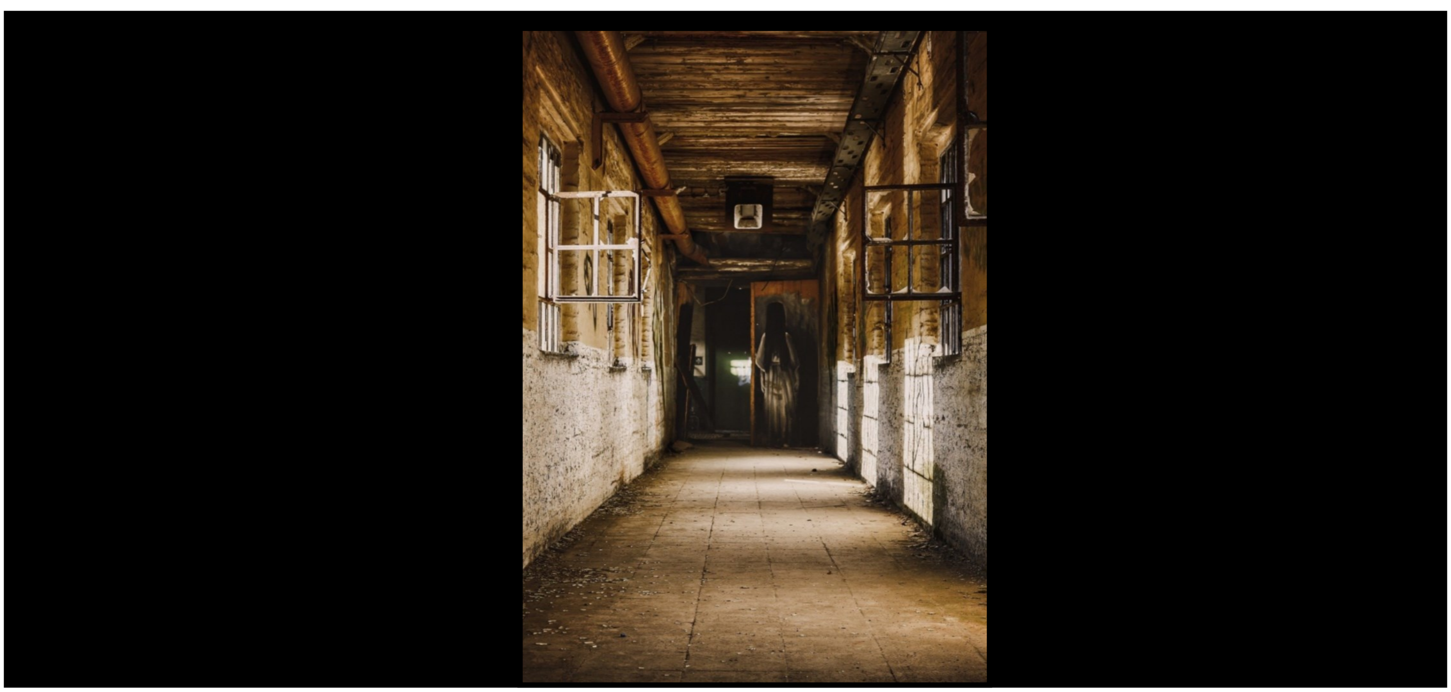

Sally, the Lost Opportunity

Abir Mullick

It was a Fall night around 1am and I was in my office in Buffalo, busy keying a proposal on my desktop. Because laptops were uncommon then and I had no computer at home, I was in the office working to meet a deadline.

My office was rather large, and it was on the third floor of a historic building called Hayes Hall. The doors to enter Hayes Hall and the corridor to my office needed a key card to unlock. Hayes Hall being an old building, many things did not work well but we managed with what we had.

My office and the office of our secretary were on the right side of the corridor. The two offices were side by side and a small door connected them. The door to my office from the corridor did not work well, so it was permanently locked, and I used to enter my office through the secretary's office. Once inside the building, getting to my office meant unlocking the door to the corridor, walking down about 30 feet, and using the door to the secretary's office to enter my office. To direct visitors through this maze of doors, I had put up a sign outside my office door, "PLEASE USE THE OTHER DOOR" and it had an arrow pointing to the secretary's office.

My office was rather large, and I had partitioned off a smaller office space within It for me. Outside the partitioned office, was a small lounge to meet visitors and a small library with reference materials. Sitting at the computer, I had a clear view of anyone entering my office because the partition wall was low, and I could easily see the door between the two offices. The door to the secretary's office had a gentle squeak, which always alerted me when it opened.

The night I met an old woman in my office, it was quite late, and I was exhausted from working long hours. I was feeling chilly and wished the heat was on. The light over the computer brightly lit the work desk but the room was dimly lit from the light that escaped out of the work area.

Suddenly, I heard a knock on my office door that was locked and it had a sign with an arrow. Wondering who it might be and why anyone is disturbing me this late, I felt irritated and said with a snap, "Please use the other door" and kept working. I did not hear the door squeak and so don't know how long it was before I lifted my head up, and to my utmost surprise, saw an old woman standing near the door. I could not believe my eyes and so I blinked a few times to confirm what I was seeing; Yes, there was an old white woman in her 80's. She had a lot of wrinkles on her face and the shadows from the wrinkles made them look like she had whiskers. She was about 10 feet away from where I was sitting and I was seeing her from over the partition wall; she seemed short and had thinning blonde hair, which were untied, uncombed and about shoulder length. Her light blue eyes were sparkling in the dimly lit room as she gazed directly at me. She looked terribly pale and her white skin showed the veins underneath. She wore a long sleeve nightgown that had floral patterns and a thin pink ribbon held a gather around her neck. Despite the low light, I could see that the nightgown was wrinkled and quite old.

But she looked very peaceful and did not raise any fear in me. I did not feel disturbed though her stern look froze me in a state of awe. Despite the distance between us, I could see her right palm cupped forward as though she was going to ask for something. And she said, "Do you have a quarter?"

This is when I felt invaded, and I said abruptly, "No

Sally, the Lost Opportunity - Abir Mullick

I don’t have a quarter”. I reacted sharply because of what I was seeing. She did not ask if I had a dime or a nickel, and on hearing my "No", she turned around and started to walk towards the door. Suddenly something struck me, and I said, “Stop. Is this what you do? Go to people’s offices late at night and ask them for a quarter”. She looked back at me, gave me a Mona Lisa smile, and started walking towards the door.

This is all that happened to me. I wrapped up my work, put my things together and left for home. For about two weeks I did not talk about it to anyone. I was worried that this incident might scare people and they will stop visiting me. One day when I opened up to people, everyone felt odd and few students mentioned that they had occasionally seen, only from the corner of their eyes, an old woman sitting at the secretary’s desk at night. After this incident, whenever I tried to work late, I felt uneasy as though a voice from within me was asking me to leave, “Go home. It's our time now”. Once when I attempted to stay late, the voice within me grew so loud that I had to rush off leaving everything behind.

My encounter with the old woman kept me preoccupied and I blamed myself for not giving her a quarter. I felt I missed out on the opportunity to examine who she was and wondered if I had given her the quarter, would it have stayed in her palm or just seeped through it.

Many thoughts kept me immersed and I questioned who came to see me? Do I know her from somewhere? Why did she choose to visit me? Considering she provoked no fear in me, I thought about the gentle soul with awe and amazement. I began to feel that the encounter was purposeful and there is a message in it.

I thought about the elderly people who regularly participated in my research work and wondered if anyone from that group came to visit me. Then, one day at a Eureka moment, I thought of Sally, an old woman who had long ago participated in my research. Suddenly, I detected a strong resemblance between the visitor and Sally; both were short, white, blond with shoulder length unkempt, uncombed and unwashed hair.

Sally was very poor, and she was referred to me by Terry, a nurse who used to monitor her health. Sally lived in an old dilapidated neighborhood with homes ready to be torn down. Many had boarded windows and some had bars on them. Sally lived on the ground floor of a two storey home and the squeaky sound

from opening the front door used to get her dogs and cats restless – dogs barking in a bad chorus, cats running helter-skelter and Sally screaming to calm them down. Sally loved her pets - they were her only companions. Judging from the state of her living room, she lived in a shabby home and it stank of pet odor.

Once my experiments got over, I rarely stayed in touch with my subjects, except for Sally. She was kind, caring, needy and very alone. She used to call and beg me to visit her. Sally had outlived three husbands and she talked about them with a glow on her face. Her second husband Al was a US war veteran

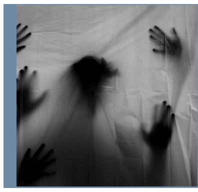

and her eyes glistened, when one day, she showed me the medals he had received. She talked about dancing with him and hummed the tunes with her eyes closed. She brought out gowns she wore and described the makeup she used to put on when she went out with Al. Clearly, in those moments with me, she was reliving a memory.

After visiting her a few times, one day Sally asked me for fifty dollars as her monthly checks were not enough to pay for groceries. I gave the money and I left. When I narrated this to Terry, she was not happy because she felt that Sally was using the cash to buy alcohol. She forbade me to give her money, instead she advised to take groceries for her. Following that incident, I avoided Sally despite her frequent calls. Gradually, her call stopped coming and I forgot about her. But the picture of the visitor in my office, brought back memories of Sally. I called Terry to find out about Sally; only to find out that she had died though Terry could not tell me when.

I felt deeply saddened by the news and I cursed myself for listening to Terry. If only I had not ignored her calls, I thought to myself. I blamed my poor judgment and felt horrible about ignoring her pleas to visit her. The voice. “darling, where are you” on my answering machine, began to echo loud in my ears. That I avoided her when she needed me, started to make me feel small. I lamented over the lost opportunity to say goodbye and I cursed myself for not meeting her. As I grieved in silence, I remembered an incident with Sally. After visiting her for a year, one day she asked me if I could take her out to dinner. On a Saturday evening, I picked her up and took her to a restaurant of her choice on Hertel Avenue. It was a hole-in-wall restaurant, but it served food she liked. While I ordered a simple pasta dish, I vividly remember her ordering Midnight pasta, a dish made with garlic, Anchovy’s, and lots of olive oil. The orders came and while we were eating, she talked about having been here with Al and pointed to a table where they sat. As she twirled her fork in a sea of olive oil, I could see oil drip down in sync with her tears of joy. She was completely dissolved in her memory of Al; she was not eating pasta alone.

As I thought about the dinner with Sally, I smiled. I felt happy that I could take her out. I felt comforted by the opportunity that I could help her relive her past. As I smiled in silence with my eyes closed, I remembered my time with her and said, “Goodbye Sally until we meet again”. BUT I NEVER SAW HER AGAIN.

বাংলা ভুলি কি করে

রঞ্জিত দত্ত

মানুষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে,
চেতনা নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানে।
বিজ্ঞান আজ মিশেছে শাস্ত্রে
শাস্ত্রের জ্ঞান প্রাণে।
জ্ঞানের ধারণা বিদ্যায় থাকে,
বিদ্যার প্রকাশ ভাষায়।
যে ভাষায় প্রথম মাকে ডাকি,
সেই ভাষা মিশেছে রক্তে।
ভাষা আমাদের মাতৃ সুধা
মাতৃ-দেশের গর্ব।
ভাষার ভক্তি মাতৃ স্নেহে,
তাই স্নেহ খুঁজে ফিরি বাংলায়।
বিদেশ বাসে, বিদেশি ভাষায়,
অনুভূতি-গুলো অনুভবে
আজও বাংলায়।
তাই বাংলার টানে মন পরে রয়,
ভুলি কি করে বাংলা ?

Georgia Residential Mortgage Licence # 19325
RARIRO
NMLS#163642
MORTGAGE
RESIDENTIAL/COMMERCIAL
HOME LOAN
The way you just imagined
RARIRO
MORTGAGE
Primary homes/Secondary homes/Investment property
Cash flow loan, payment rate as low as 1 % *
Conventional/Jumbo/ARM/fixed/ Interest only loans
Ask about 98% financing option/New 95% LTV with no PMI
DEBT CONSOLIDATION /CASHOUT(Payoff credit card debt)
FREE lock/FREE no obligation quote
SBA commercial loans up to 90%(Gas stations and business)
Working with more than 30 lenders/banks
As low as 620 credit can get 98% loan.
100% satisfied customers all over Georgia.
NO CLOSING COST LOANS.
Come with competitor quote, we will match it.
100% Customer satisfaction.
24/7 7 days a week.
Refer your friends and relatives.
Lower interest rate than your regular bank.
ESTD: 2004
EQUAL HOUSING OPPORTUNITY
REFINANCE AND GET RID OF PMI AND REDUCE YOUR MONTHLY PAYMENT
GIJO MATHEW NMLS#164963
120 BROOKEIVEY LANE
ALPHARETTA, GEORGIA-30004
PH: 770-521-0044 (24/7), CELL: 678-488-4248
FAX: 770-360-7770
Email: rariro@gmail.com, www.rariro.com

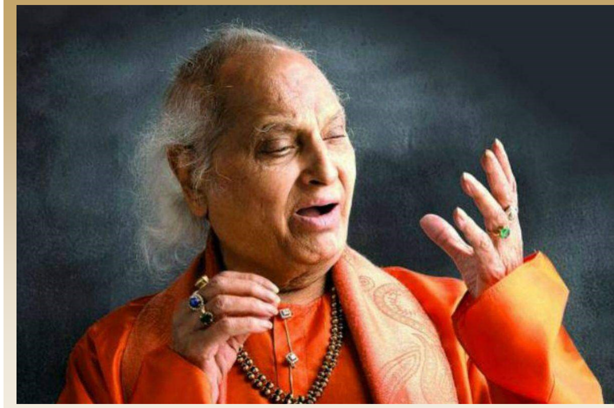

Pandit Jasraj

An interview on the Classical Musical Legend with his disciple, Pritam & Prithwi Bhattacharjee.

Bengali Association of Greater Atlanta pays homage to

Padma Vibhushan Sangeet Martand Pandit Jasraj

Pandit Jasraj, the legendary Indian classical vocalist, recently passed away on 17th August, 2020. His death leaves a deep void in Indian cultural sphere.

Apala and Surajit Bandopadhyay, students of Pandit Jasraj Music School of Atlanta, prepared the written question and answer session with their Guru Pandit Pritamji and Pandit PritwirajJi to know about the life and teachings of their Guru Pandit Jasraj-ji.

Pritamji, you are one of his foremost disciples. Please tell us more about your Guru, his musical journey and contribution in Indian Classical music.

Pritamji: Guruji's demise is a huge loss for the entire world of music. Personally, it has left a vast and a deep void within me. He was not only my guru, but also a father figure to me, a true friend, philosopher and a guide! As my Guru, he was the embodiment of Param Bramha , the God to me, "Guru r Brahma guru r Vishnu guru r devo Maheshwara". As his *shishya*, I feel extremely blessed and fortunate to not only learn music from him, but also, I learned the essence and meaning of life, of being, of humanity, spirituality and integrity of character.

My guru ji, Sangeet Martand Padma Vibhushan Pandit Jasraj-ji was a living legend of Indian classical music. Soulfulness and spirituality were central aspects of his music; music that was par excellence. He popularized Indian classical music amongst the masses and was one of the greatest musicians of all time. Belonging to the Mewati gharana, his musical career spanned for 75 years resulting in national and international fame and respect. He received numerous major awards and accolades including three of the highest civilian honors for Indian citizens; the Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Guruji was honored with the title "Sangeet Martand" which means "Sun of the music". Recently, he became the first Indian musician to have a planet named after him. The planet "Panditjasraj", orbits the sun between Mars and Jupiter.

Although he belonged to the Mewati gharana, a school of music known for its traditional performances of 'khayal', Guru ji additionally and successfully popularized semi-classical musical styles such as Bhajan and Haveli Sangeet.

Pritamji, please tell us about your musical journey and how you became his disciple?

Pritamji: I was highly drawn towards Pandit Jasraj-ji's music since I was a child. I was only 7 years old when I became an ardent follower of Guruji's music and thus considered him as my Guru even before formally I became his disciple. I used to listen to his music recordings of earlier times. It was a divine in-

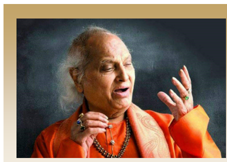

tervention for me when Guruji visited my hometown, Silchar in Assam, India for a concert (never before and never after has Pandit Jasraji-ji performed in Silchar since then!). I was 13 years old and was very excited to hear him and meet him in person. After Guruji's concert, I met with him and told him excitedly how much I love and followed his music. Guruji then asked me to sing something for him. I was overjoyed and with all humility and confidence as a 13 old boy, I sang his composition "Ab thare bina" in Raag Puriya, that I had learnt only from his recordings. Upon hearing me sing the composition, Guruji was so thrilled and pleasantly surprised that he immediately asked to meet my parents to seek their permission to take me to Mumbai with him as his disciple. He didn't want to wait even for a day! With Guruji's and Almighty's blessings, a new chapter of my musical journey started in Mum-

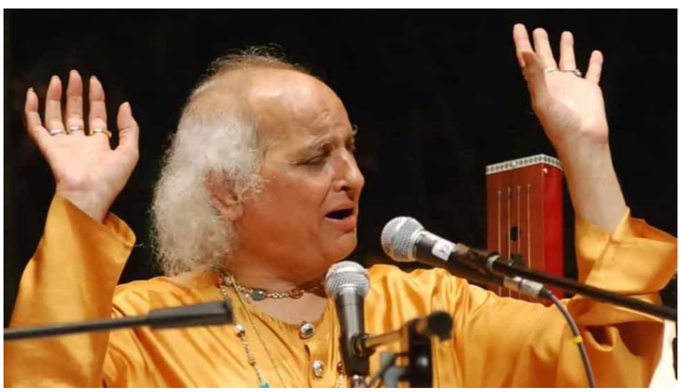

bai as his shishya under his tutelage that has paved the course for my entire life.

Pritamji, probably you stayed in Pandit-ji's house for a few years as per "Gurukul parampara", please share some details about it and day-to-day life that you spent with him.

Pritamji: My *taalim* under Guruji's tutelage started after I shifted to Mumbai and became his disciple. I lived with him at his home to learn music. Sometimes the teachings took place at his home, sometimes when we were traveling for concerts, sometimes at the dining table, sometimes it took place right on the stage during the program. As an inquisitive learner, I always had several music related questions for him and he always explained them lovingly, patiently and promptly. Even during his busiest schedule, he always found time to respond to my questions – no matter where and when I asked

Prithwiji, you are one of foremost disciples of Late Ustad Allahrakha Khan Saheb and living legend Ustaad Zakir Hussain ji, and Director of percussion in Pandit Jasraj School of Music in Atlanta. Please tell us your interactions with Pandit Jasraj-ji.

Prithwiji: I used to listen, admire and follow Pandit Jasraj-ji's music since my childhood along with Pritam through the recordings we had. However, my close and personal association with Pandit Jasraj-ji began when Pritam became his disciple. Panditji very lovingly welcomed both us into his world of music and also as his family. I have learned a lot about music, life and performance skills from him. He was a storehouse of music and joyful lifestyle. I have had the distinct privilege of performing with and accompanying him in several concerts, that has enriched my own musical journey as well.

Prithwi ji, can you please tell us how and when Pandit ji thought about having schools in the USA? In which cities in the USA do we have PJSM branches? Outside India, in which other countries do we have schools? Why did he choose Atlanta?

Prithwiji: It was Panditji's vision and dream to popularize and reach Indian classical music across the world, especially in the USA and Canada. He wanted to reach out to Indians as well as non-Indian population. Pandit Jasraj Music Schools are founded in Atlanta, New York, New Jersey and Tampa in the USA. Also, we have music schools in Vancouver and Toronto in Canada, and in Mumbai, India. I must say that it was the people in these cities, whose love for his music, interest & eagerness to seek this amazing opportunity to have schools of such high level of

excellence and stature, prompted their repeated requests to Panditji to give permission to open schools in their cities. Panditji on his own never decided on specific cities to establish the schools. The people were so enthusiastic and keen that schools were founded in these cities.

Pritamji, can you please share Panditji's thoughts about different streams of music other than Hindustani Classical and how it all relates to each other? What did he think of light genres of music?

Pritamji: Sure. Panditji liked to listen to other genres and always encouraged young and upcoming artists, who wanted to pursue a career in other genres. However, Panditji always advised every youth to first undergo training in Indian classical music before delving into other genres. He firmly believed that Indian classical music is the father of all other genres, and thus an initial training in Indian classical music would lay a great foundation for anyone pursuing other genres or different streams of music.

Pritamji, we have heard about Jasrangi Jugalbandi and found it to be very interesting. Can you please explain/elaborate more about it?

Pritamji: Yes, Jasrangi Jugalbandi is a very interesting and unique concept created by Guru ji, where male and female artists perform jointly without compromising their range, but using the "murchhana bhed" (transpose) approach where two different ragas with coinciding notes are used.

Prithwiji, we all know that mainstream Hindustani classical music training is given in PJSM in Atlanta. Is there any other genre of music taught here?

Prithwiji: At present only pure Indian classical music, both vocal and Tabla, are taught at PJSM in Atlanta. However, in the near future, PJSM Atlanta plans to introduce semi-classical and light classical genres like bhajan, ghazal, tappa, thumri etc.

Panditji's vocal range spanned across 3 and half octaves, while it must be God gifted, did he do any special training on it?

Both: Panditji was gifted with an amazing vocal range that spanned across 3 and half octaves. He utilized his entire range very intelligently and perfectly in his singing.

We heard that Panditji knew a lot of languages and could speak many of them. Can you please share some details around it?

Both: Yes, truly and amazingly he had an uncanny ability to learn or absorb different languages. He was fluent in Hindi, Haryanvi, Avadhi (also called "Braj bhasha") Marathi, Gujrati, Bengali, English and some southern languages. He has written and composed many compositions in some of these languages.

What message would you like to give to music lovers and today's youngsters on his behalf ?

Both: Panditji always emphasized on learning the

pure art form of India classical music as a must and as a foundation to any form of music that music lovers or youngsters may want to pursue. He always stressed upon learning and mastering this art form before singing or performing any other genre.

Are there any ragas that he was particularly fond of and sang more than others?

Both: Although Panditji liked to perform most of the ragas, like many of the Indian classical musicians, some of his favorite ragas are Darbari Kanada, Puriya, Malkauns, Bihaag, Maru Bihaag, Bilaskhani Todi, Gurjari Todi, Bhairav, Ahir Bhairav, Bairagi Bhairav, Nat Bhairav, Basant Mukhari, Jog, Lalit, Bhimpalas, Bhairavi to mention a few.

Tell us more about Mewati gharana and things that are specific to this gharana and how it's different from others?

Both: In Mewati gharana, the melodious aspect of singing is given more importance along with the devotional aspects. Some of the intricacies of rendering of the raga makes it different from other gharanas. Also, the very uniqueness of rendering which we call "gayaki", along with tayyari & layakari makes it distinct as a gharana.

Are there any special ragas that are performed primarily in Mewati gharana?

Both: Yes, there are many ragas that are exclusively rendered by Mewati gharana artists. Among them many have been popularized by Panditji himself.
Some of these ragas are Nanak Malhar, NagDhwani Kanada, Khamaj Bahar, Nat Narayan, Shuddh Barari, Dhuliya Malhar, Charju ki Malhar.

Pandit ji lived in Kolkata for some time, can you please share any details around it and his influence on Bengalis?

Both: Pandit ji lived in Kolkata for well over a decade and loved Bengali culture. He was very fluent in Bengali. In the late 1950s, after he moved to Mumbai and became famous, Bengali population were greatly influenced by him. Since then, he has always been very popular among Bengalis.

উৎস

শিখা কর্মকার

তোমার আঙ্গুল থেকে, নখ এবং গাঁট থেকে,
ঝরে পড়ে কবিতার রাশি। তোমার বলিষ্ঠ কাঁধ,
নিয়ে আসে প্রবন্ধ-শরীর; নিখুঁত কণ্ঠ থেকে,
রেশমি ঝর্ণার মত, বয়ে যায় গান।
প্রতিযুগে দেখি তুমি, বদলাও রূপ ।
ময়ুরপঙ্খীতে চড়ে, ভেসে যেতে যেতে,
তুমি কখনো সওদাগর, কখনো সম্রাট।
কালস্রোতের থেকে ফিরে এলে দেখি,
পোশাকের সমুহ গ্রন্থিতে, উষ্ণীষ চুড়ায়,
চুলের জটায়, অসম্ভব অভিযান, রহস্য-গভীর।
তোমার দুচোখে আমি, কখনো রাখিনি চোখ
তবু জানি ভালোবাসা, আলো হয়ে ঝলমলায়,
যেন কল্পতরু; ভুলেও কখনো আমি, ছুঁইনি ওই ত্বক
তবু টের পাই, ঝড়ের ঝাপটা প্রতি গল্পের শরীরে।

কিভাবে যে জেনে গেছি, তোমার সারাটি দেহ
সুখপাঠ্য উপন্যাস হয়ে, শুয়ে আছে ভাগ্যরেখায়,
যেন অনন্ত কাহিনী এক। নিঃশ্বাসের কাছে যেতে
ভয় হয়, সনেটের ভ্রূণ যদি মুছে ফেলি ভুলে।
লেডিবাগটির মত চোখের আড়াল থেকে দেখি,
নদীর মত বয়ে গেছ ভাব ও ভাষার স্রোতে,
চর্যাপদ, দোহা ও মঙ্গলগীত পার হয়ে হয়ে
বদলাচ্ছে রূপ তোমার সময়ের ঢেউয়ে।
এ যেন হাওয়ার হাত ধরে পৌঁছে যাওয়া,
অভীষ্ট লক্ষ্যে জ্বেলে দিতে আশ্চর্য প্রদীপ।
কিভাবে যে জেনে গেছি, তোমার সারাটি দেহ
সুখপাঠ্য উপন্যাস হয়ে, শুয়ে আছে ভাগ্যরেখায়,
যেন অনন্ত কাহিনী এক। নিঃশ্বাসের কাছে যেতে
ভয় হয়, সনেটের ভ্রূণ যদি মুছে ফেলি ভুলে।
লেডিবাগটির মত চোখের আড়াল থেকে দেখি,
নিখুঁত সংসারে তোমার, অনন্য গ্রন্থাগার এক,
সময়ের বুকে জ্বলা আশ্চর্য প্রদীপ।

Opinion :

Jamai Shashthi: Is this tradition discriminatory?

Asit N. (Shen) Sengupta

Introduction: *Jamai Shashthi is a Bengali tradition in which the bride's family hosts an annual function and celebrates their son-in-law. This age-old tradition is probably rooted in the joint-family, and teen-marriage customs, observed in earlier India.*

Today, 28th May, 2020 is Jamai Shashthi or the day to celebrate the Son-in-Law. I have no idea why it is observed; moreover, why is there no parallel day to celebrate the Daughter-in-Law? Similarly, there is a Brother's Day (Bhratri-dwitia), but there is no Sister's Day. Wondering why! In both cases, men seem to be more valued by society than the women. Does it give a message that men deserve to be valued and pampered more while the women can be overlooked? On both celebration days mentioned above, the son-in-laws and the brothers are pampered by the mother-in-laws and the sisters respectively, with the best dishes available. The mother-in-law receives a *pronam* (a humble salute) at most and the sisters may receive nice gifts, like saris. It is shocking that such discrimination is perpetuated mostly by women themselves, while the men also accept that as their fair due.

One may say, "well, but don't we worship Mother Durga, at least in Bengal, with so much pomp that no festival on Earth can come anywhere near it?" That is true but such worshiping has little bearing on society when it comes to the treatment of women. There are many examples of inequality or shall we say, unfair treatment which are dished out to women, particularly towards widows.

Losing a husband often means losing virtually everything, robbing the widow of any pleasure of living. A widow has to wear only borderless white saris and no jewelry. She is asked to give up not only all meat, fish and eggs but even garlic and onion, which usually go to flavor such food; she cannot use the same kitchen or utensils used by others. Heaven forbids, she cannot marry again but a widowed man can and does so routinely. Often dispossessed of any monetary or property rights, she is treated more of an economic burden than a real person; all because she had sadly lost her husband. Fortunately, in modern times, such is not the norm, but surely it lives on.

Rabindranath Tagore wrote: "After thinking about it for a long time, I have concluded that men are somewhat dis-jointed but women are quite complete (ami onek din thekey bhebe dekhechhi

purushra kichhu khapchhara aar meyera besh shusompurno)."

Whenever I see that women are fighting for equal rights, I wonder why! In most ways, except physical strength, women are so much more than equal. It is she who brings us to the world, nourishes us, makes our homes, and looks after us when we are not well. She does not discriminate between men and women. Men are incapable of equaling her feat. Women, are you listening? Get on with it and count on many of your sons backing you up. Be the real Ma Durga!

আমার ডায়েরি থেকে

দেবশ্রী চ্যাটার্জী

সেদিন টা ছিলো ২৯শে ডিসেম্বর, ২০১৪ সাল, আমরা শীতের ছুটিতে উইস্কনসিন চললাম ছুটিটা কাটাতে। ফার্গো, নর্থ ডাকোটায় শীতকালটা ভয়াবহ শীত, বিকেল বেলা চারটে সাড়ে-চারটেয় ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমে আসে। তাই আমরা দুপুর দুপুর বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে ছোট্ট ইউ ক্লেয়ার শহরটা ঘুরে দেখলাম। কিন্তু যেমন আসে ঝোড়ো হাওয়া, সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে যায় তেমনই এক ছোট্ট দুঃসংবাদে খুব মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম সেইবার। একজন সন্তানহারা মা-র বেদনা মনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। আর দু'তিন দিনের মধ্যে আমার ইউনিভার্সিটি খুলবে, ক্লাস নিতে ছুটতে হবে রোজ, কিন্তু মনটা যেন বিক্ষিপ্ত, কিছুতেই পারছি না এই অব্যক্ত দৃশ্যটা থেকে দূরে গিয়ে কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন করতে নিজেকে। সেই মনের বেদনাকে উন্মোচন করতে পেরেছিলাম নিজের লেখনীতে।

৫ই জানুয়ারি, ২০১৫

স্তম্ভিত আমি, ভাবি তাও
এগিয়ে চলার শক্তি দাও --
আজ যে মাতা সন্তানহারা
যুক্তির আঁধারে দিশেহারা !

কোথায় তুমি গেলে চলে ?
দাপিয়ে গেলে হেসে খেলে।
যেথায় গেছো থেকো ভালো-
জ্বালিয়ে রেখো রঙের আলো ।

এই দুনিয়ায় আছে যারা
প্রিয়হারা, বাক্য হারা -
সেই আলোতে দেখবে তোমায়,
হারবে আঁধার, নব চেতনায়।

ক্ষমতাশালীর দেখি কৌশল -
দুর্নীতি আর রোষের বল।
জাতপাত আর বর্ণ বিদ্বেষ -
মরছে নবীন প্রবীণ নির্বিশেষ।

জগৎজননী, তুমি তো মা
দেখছ নাকি এই যন্ত্রণা ?
থামাও মাগো রোষের আগুন -
প্রবাহিত হোক শান্তির ফাগুন।

আসুক সাম্য, আসুক স্থিতি,
বিনাশ হোক লালসা - ভীতি।
থামুক না রোষ দ্বেষ আর বৈষম্যতা,
স্থায়ী হোক ভালোবাসা আর সাম্যতা।।

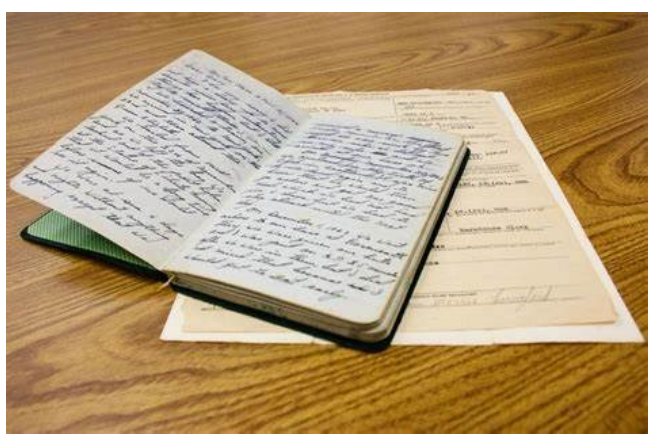

কবিতা গুচ্ছ

প্রীতম ভট্টাচার্য

সুখ ও শান্তি :

'সুখ' বলে আমি কারো নই যে আপন
একঠাঁই নাহি থাকি আমি যে কখন
আমারে না পাইলে নর অশান্তিতে ভুগে
'আমি শ্রেষ্ঠ' প্রমাণিত হই যুগে যুগে
'শান্তি' কহে শান্ত ভাবে ওহে 'সুখ ভাই'
আমারে পাইবার নিয়ম একটাই
কোনো মূল্যে স্বীকার না করি নিমন্ত্রণ
সুখের আশা ত্যাগিলে করি আগমন II

নিন্দা ও প্রশংসা :

'নিন্দা' কহে' 'প্রশংসা'রে আত্মনিন্দা করি
আমারে না চাহে কেহ দুঃখেতে যে মরি
তোমারে পেতে সবাই কত চেষ্টা করে
আমার ছায়াকেও সবাই ভয় করে
'প্রশংসা' কহিল দুঃখ করো নাকো ভাই
ভালো কথা তোমারে ভয় পায় সবাই
তোমার ভয়েতে কেহ মন্দ নাহি করে
আমি মূল্য পাই ভাই তোমারই যে বরে

উপহাস :

'দিবা' করে উপহাস 'সন্ধ্যাবেলা' তরে
অল্প আয়ু তব আসো কোন আশা করে
সন্ধ্যা বলে স্বল্প আয়ু ধরি আমি তাই
তোমা সনে রাতের মিলন করে যাই II

Fear, Confusion & Rising Awareness of Human Consciousness

Malabika (Nita) Bose

It is a crisp, autumn morning and I sit on the deck outside; as the whipping wind makes me shiver. I enjoy the silent, peaceful beauty of the blooming flowers and tall, strong trees with their leaves changing into vibrant red, orange, and yellow. In the distant horizon, the lush green rows of the north Georgia mountains shine against the flawless blue sky. I feel a heavenly anticipation in nature for Ma Durga's arrival. All Bengalis around the world eagerly wait for the arrival of the Goddess of strength to worship and celebrate her with pomp and festivities. But I sadly realize that, this year we have to welcome and worship Ma Durga in our hearts.

2020 has been a defining year. It started with the usual hopes and promises, but unbeknownst to us soon the world would go through an unprecedented time. Suddenly, the coronavirus transformed our lives beyond recognition.

Poet Haroon Rashid writes:
“We slept in one world and woke up to another
Suddenly Disney has no more magic,
Paris is no longer romantic, and
In New York everyone sleeps and
Chinese wall isn’t a fortress anymore.”

As the world plunged into a pandemic, our hearts and souls froze with the fear of loss, death, economic uncertainties, and the unpredictability of this unknown virus. Shelter-in-place and Lockdowns orders forced us into isolation within the four walls of our homes. Unemployment, challenges with child care, online schooling, and the scarcity of essentials created confusion and psychological distress.

But humankind is resilient and, as we tried to make sense of the new world and the new reality, some silver linings emerged.. We returned to basics and found new respect for nature. We rediscovered the value of family as we spent quality time with them and reached out to our neighbors, friends and extended families through modern technologies. Creativity flourished as the pandemic compelled us to

find new ways to connect, make art, and embrace our faith and humanity. Medical professionals and front line workers went above and beyond the call of duty and became our heroes. Like sunflowers on a cloudy day, missing the sunlight, amazingly turning to each other for the energy to bloom, we turned to our fellow humans for support and strength.

And during this global catastrophe, suddenly national boundaries vanished. People from every cor-

Fear, Confusion & Rising Awareness of Human Consciousness

Malabika (Nita) Bose

ner of the earth, humbled by the frailty of our lives, awakened to a collective consciousness of a sense of the oneness of humanity. It reminds me the phrase from the Hindu Upanishad*, Vasudhaiba Kutumbakam..*(বসুধৈব কুটুম্বকম) meaning "The world is One family". I wonder how the Historians are witnessing this worldwide health, economic, political crises and how they are trying to fathom the magnitude of uncertainties that will change our world.

Sometimes this pandemic along with the wildfires on the west coast, hurricanes, and floods, and the recent disaster of 'Amphan' in West Bengal, make me ponder about the mythical reckonings . But in reality, that is not something I am concerned about... rather I think about how the effects of this year will reshape the existence of the future generations so they continue to thrive on this precious earth. As the scientists, epidemiologists, and pundits calculate, research, and predict the future, I am engaged in connecting with loved ones through socially distant visits or through technology and virtual hugs. These connections give me some solace as I quote Rabindranath Tagore.....*Angabiheen Alingone Sokol Anga Bhore* (অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে.)

Chandi Story

Partha Mukherjee

A royally dressed person roaming on the stage. He appears to be bewildered and with some serious thoughts.

King: Where am I? What am I supposed to do in this dense forest? Nobody's here around! (Looking around) Do I see a person yonder? Yes, yes! Ahoy! Do you hear me? Yeah, I am calling you. Please come here. Let me talk to you, please!

A well-dressed person with a pagri appears with folded hands.

Vaisya: Pranam, Maharaj! Did you want to talk to me?
King: Yes. Who are you?
Vaisya: I am a businessman, Samadhi is my name, Sir.
King: Why did you address me as Maharaj?
Vaisya: Who does not know the famous King Surath? Are you on a hunting trip, Sir? Where are your bodyguards?
King: I will answer you later. First, you tell me what are you doing here? Who is attending your shop?
Vaisya: I am going through some misfortune presently. My family has snatched all my possessions and disowned me. They have deported me to this forest. Am I lucky to see you here! Please protect me from wild animals, Sir.
King: Who me! I am facing the same fate as yours! My family, ministers, soldiers have all banished me from my kingdom. I am wandering about in the forest and I keep thinking about what course I should take now.
Vaisya: Something is astounding me very much. Have I lost my mind?
King: No, please do not lose it. You have lost all your relatives and possessions. Mind is the only thing you have. Pray, so you do not lose it too.
Vaisya: Oh, King, just think of it. My wife, children, servants - they are the ones who have wronged me. And yet, all my thoughts are about them! How they are doing without me, what they are eating, how they are procuring food... these thoughts are worrying me all the time!
King: By jove! I am distressed exactly the same way! Why so? We're no juvenile idiots! All my current worries are about my family, my ministers, my subjects and even my horses and elephants!
Vaisya: That's a mystery to me, oh King! I am totally bewildered!
King: So am I, flabbergasted! We need someone to help us in this matter.
Vaisya: I know, Medhas Rishi's Ashram is nearby. Let's seek and pray for His advice and blessings.
King: Yeah, it's the best idea. Let's do it. Do you know the place?
Vaisya: No, Sir, but I know it is in this forest. I'm sure we can find out.

The two started roaming about. As they walked to one side of stage—
King: (Pointing off-stage) I see yonder a hermitage.
Vaisya: Yes! That's His place. Let's hurry. I am hungry and thirsty.
King: So am I. Let's rush.

They hurriedly walked off the stage.
Medhas Rishi is sitting on the ground reading some books. King Surath and Vaisya Samadhi entered and bowed down to touch His feet.

Rishi: Welcome, gentlemen. Please be seated. May I know your names please?
King: Revered Sir, I am Surath.
Rishi: Oh! The king! Welcome to my humble abode. (Turning to Vaisya) And you?
Vaisya: My name is Samadhi. I am a businessman by

trade.

Rishi turns towards the back stage and waives. One lady enters.

Rishi: (addressing the lady) Priyombada, our guests, King Surath and Vaisya Samadhi. They look tired, hungry and thirsty. Bring some fruits and drinks for them.

Priyombada nodded and went out.

Rishi: What brings you here?
King: My ministers, soldiers and even my wife and children have forsaken me. They have chased me out of my kingdom. So, I have come to the forest.
Vaisya: My family has also driven me out of the house after snatching all my possessions.
King: I was a king and he was an established businessman - not some uneducated fools! But we are always thinking about the welfare of the people who has wronged us! Why? What's happening to us?
Rishi: You are neither fools nor mentally deranged. Education and sense, the two things you are so proud of, are possessed by all animals. Yet they also suffer from this malady.
Vaisya: Who forced us into this situation? We didn't get there intentionally!
Rishi: The natural force that overpowers all of us is called MAHAMAYA, or big illusion. Mother Nature has to keep the whole world moving , including all inhabitants - humans and animals. This is how She keeps revolving forever.
King: Who is this MAHAMAYA? When was she born? How long ago?
Rishi: She is truly Omnipotent or preeminent and supreme, Omnipresent or all pervading and Omniscient or all knowledge. She stays hidden almost always. However, many times in the past, She had taken human forms to save the world and mankind from annihilation. People wrongly call those appearances as Her births.
Vaisya: Please tell us about those appearances and actions of Her. We pray thee!

Priyombada with a second lady entered with two plates of fruits and sweets and two glasses of drink. Putting these in front of the King and Vaisya, they leave the stage.

Rishi: There are innumerable stories about her appearances in the PURANAS. Oh! King and Vaisya, you both look tired, hungry and thirsty. Satisfy yourselves with this meager offering as I narrate three of the most famous appearances of MAHAMAYA.

King and Vaisya started eating.

Rishi: It was the beginning of time, when there was nothing but water all around. Lord Vishnu was in deep sleep on the famous Serpent, ANANTANAG, floating in the water. On a lotus emerging from Vishnu's navel was Lord Brahma, seated and in deep meditation. He was mentally conceiving this earth as His next creation. Suddenly, two demons came out of Lord Vishnu's ears named Madhu and Kaitav. They immediately tried to kill Lord Brahma. He panicked and then He went into prayer of MAHAMAYA to awaken Lord Vishnu.

SONG Jago Tumi Jago (Dwijen Mukherjee's song in Birendra Krishna Bhadra's MAHISASURAMARDINI)

Rish: Satisfied and pleased, MAHAMYA awakened Lord Vishnu, who fought those two demons. After five thousand years of fighting, they were finally defeated and killed. Their bodies fell in the water and transformed into land of this Earth.

King: Is this why we call it MEDINI?
Rishi: Yes, King.
Vaisya: This is really fascinating!
Rishi: The second time he appeared to destroy the demon MAHISASUR.
King: She appeared as Devi Durga?
Rishi: Yes. MAHISASUR was a very serious ascetic. He meditated for a long period and pleased Lord Brahma and asked for immortality. When told that nothing in this world can be immortal, he asked for a boon to be invincible by any day and any night by any MALE. To him, it was as good as immortality.
Vaisya: But he was killed by Ma Durga! How was it possible?
Rishi: Mahisasur believed he was immortal. He occupied SWARGA, MARTYA and PATAL and started bullying everyone. All living beings were totally bewildered. Led by Lord Brahma, they approached Lord Vishnu and Lord Mahadev for redress. Listening to the atrocious and brutal behavior of Mahisasura, Lord Vishnu and Lord Mahadev were furious. They combined their cosmic energies to create Female Goddess Durga. All inhabitants of the three worlds decorated Devi Durga and shared all weapons. Devi went to destroy the demon.

SONG & Jayo Jayo Japyajaye…Ramyakopardini Sailo Suteh. DANCE

King: Now I understand why MAHISASUR was destroyed by Ma DURGA and not any male God.
Rishi: The annihilation moment was the transition between Asthami and Navami Tithi, not any specific day or night-time.
Vaisya: Is it the significance of SANDHI PUJA?
King: Is there no end to these demons? Why can't they let us live a peaceful life?
Vaisya: Did you not say MAHAMAYA is Omnipotent, Omnipresent and Omniscient? Can She not get rid of them totally?
Rishi: Yes, She can. If you think about it, these are actually dualities in our mind. They are needed to keep you alive and agile. Let me tell you the story of two siblings - Sumbha and Nisumbha. They acquired enough strength to drive out all residents of Swarga. In desperation they went to the Himalayas and prayed for MAHAMAYA to protect them.

SONG Mahavidya Adyashakti Parameshwari Kalika…. (Lyrics & Music by Kaji Nazrul Islam, Sung by Ajoy Chakrabarty)

Rishi: This time, She appeared as Devi Kaushiki. Accompanied by Devi Chamunda, she went to war and after a long battle, she destroyed first Nisumbha and finally Sumbha. Order in the three worlds was restored.
King: Oh Reverend Sir, how can we overcome this turmoil of life? How long will it take to get there?
Rishi: Devi Mahamaya sustains us during our lifetime very mercifully. If one prays to Her, She will definitely bless you.
Vaisya: What do we need to do to receive Her blessing?
Rishi: Go to a secluded area. Meditate on Her glories alone. Meditating to HER with sincerity, honesty and faith is a must.
King: How long will we have to meditate?
Rishi: It depends on the individual. You must have infallible faith. She will put you through tough tests and grade your faith in many ways. Do not falter, keep your determination to reach your goal. I assure you that you will succeed.
Vaisya: Thank you, Sir, for your kind advice. I'll definitely go for it. King: Yes, I have decided to do the same. Let's go, Samadhi.

Both bowed down to the Rishi, received His blessings and left the stage. Entered back from the other side and sat down to meditate.

After many years of austere meditation, Devi Mahamaya appeared. Both are flat on the ground doing Sastanga Pranam pose. Mahamaya enters.

Mahamaya: You, Raja Surath and Vaisya Samadhi,

please arise. I am Devi Mahamaya. I am very pleased and delighted with your prayer. Both of you have proved your qualifications. What blessings do you desire?

King: Oh, Mother, please make me a very famous person in my next birth. I desire fame.

Mahamaya: And you, Vaisya?

Vaisya: Oh, Mother, I do not wish to come back to this material world anymore. Please give me deliverance.

Mahamaya: So will it be. King Surath, you will be a Manu, the first human in the next creation cycle. Vaisya Samadhi, you will NOT be reborn anymore. Your soul will merge into me. The main point here is one must have a strong desire, determination and total faith in himself. The scriptures assure that you can achieve it if you really strive for it.

বিদায় ফুটবলের জাদুকর

পার্থ ব্যানার্জি

চুনী গোস্বামীর খেলা একবার দেখেছিলাম বালক বয়েসে। আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বোধহয় চুনী গোস্বামী। ফুটবলকে নিয়ে স্বপ্ন তারপর থেকেই দেখা শুরু হয়েছিল। ফুটবল ছিল আমাদের কাছে বাংলার, বাঙালির এক অতি প্রিয় শিল্প। চুনী গোস্বামী ফুটবলকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন আমাদের। বড্ড কষ্ট হলো আজকে হঠাৎ খবরটা পেয়ে।

চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জী, বলরাম, জার্নেল সিং, থঙ্গরাজ, সুধীর কর্মকার, শ্যাম থাপা, হাবিব, নায়ীম, রামবাহাদুর, এদের প্রায় সকলের খেলাই দেখেছি মাঠে গিয়ে। ইডেন গার্ডেনে ফুটবল খেলা শুরু হবার আগে ওই কাঠের গ্যালারির বাদামভাজা চিবোনোর, ঝেঁপে বৃষ্টি নামার বিকেলে মাথায় খেলার কাগজ চাপা দিয়ে কাকভেজা হয়ে বসে বসে স্বপ্নের দৃশ্য দেখা। সেখানেও চুনী গোস্বামী নামের এক ঐশ্বরিক শিল্পী।

আবার কুয়াশা কেটে যাওয়া ঝকঝকে শীতের সকালে হাতকাটা সোয়েটার পরা বালক আমি ইডেন গার্ডেনে সস্তার সিটে বসে দেখেছি বাংলা আর বিহারের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট। সেখানেও চুনী গোস্বামী। ফুটবল আর ক্রিকেট দুটো খেলায় বাংলার টীমে খেলতে আমি আর কারুকে দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

সারা জীবন যেসব আশ্চর্য সুন্দর, মধুর স্মৃতি বয়ে বয়ে বেড়িয়েছি, আর সারা গায়ে মেখে নিয়েছি -- সেই ভালোবাসার, নানা রঙের দিনগুলির কথা লিখে যাচ্ছি। সোনার রেণু, স্বপ্নরঙিন ডাকা সেই উজ্জ্বল দিনের অনেক কথা আগেও লিখেছি। গান, সিনেমা, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজো। জেমিনি সার্কাস, আর মনুমেন্টের নিচে জনসভা। আর ধর্মতলার অনাদি কেবিন থেকে বইপাড়ার পুঁটিরাম থেকে আমাদের মানিকতলার গাঙ্গুরাম।

আর আছে সেই পুরোনো কলকাতার সবুজ মাঠ। সবুজ মনের দিন। সেই ছবির এক সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর চুনী গোস্বামী।

৩০শে এপ্রিল, ২০২০

ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক (করোনা মহাসঙ্কটের মধ্যে লেখা শ্রদ্ধার্ঘ্য)

Homage to an Unsung Heroine of Modern India

Vimal Nikore

October 29 marks the death anniversary of a Brahmin child widow, lost in the shadows this blazing ray of light is, Shrimati Kamaladevi Chattopadhyay. She showed the courage to defy the orthodoxy of her time by marrying out of caste, the younger brother of Sarojini Naidu, Shri Harindranath Chattopadhyay.

In spite of the monumental struggles, Shrimati Kamaladevi Chattopadhyay has left behind an undisputed legacy of courage. She was a true karma yogi, and a warrior of compassionate justice, as well as an uncommon feminist, social visionary, artist, prolific writer and world traveler. She changed the image of India and shaped its proud heritage in the world. Her contributions are at par with the better-known names described as the builders of independent India. Kamaladevi's profound legacy is truly inspiring even today, as societies around the world continue to struggle with social and gender equity.

Kamaladevi Chattopadhyay was born on April 3, 1903 in a Saraswati Brahmin family of Mangalore. Her early life was marked by tragedies. Her dear elder sister, Saguna, with whom she was very close, tragically died in her early teens after a brief marriage. Kamaladevi lost her father, Ananthaya Dhareshwar at the age of seven. The family was left bereft as no written Will was left by her father. According to the then prevalent law, the property went to her stepbrother. Her mother, Girijamma was offered a meager maintenance allowance. Self-respecting, proud, strong-willed Girijamma refused the offer and moved in with her brother, determined to raise her daughters by herself. Kamaladevi too became a child widow. In 1915, at the fourteen she was married to Krishna Roa and was widowed two years later by the age of 16. Encouraged by her father-in-law, she joined Queens Mary College in Madras. It was here that through her friend, Suhasini, who was the younger sister of Sarojini Naidu, she met, fell in love with and married their younger brother Harindranath Chattopadhyay. Kamaladevi and Harindranath had a shared passion for the arts, theater and music. The remarriage was facilitated by the 1872 Marriage Act that legalized union between individuals of different caste and communities, and the remarriage of widows. In spite of the law, Kamaladevi faced intense scrutiny and opposition. As if this defiance of orthodoxy was not enough, she took the courageous step of divorcing Harindranath in 1955. Unconfirmed sources state that this was the first divorce granted by the Courts on amicable grounds. From this marriage she had a son, Ramakrishna Chattopadhyay.

Kamaladevi was exposed to politics early on at her uncle's house, which was frequently visited by Gopal Krishna Gokhale, Anne Basant, Ramabhai Ranade and other luminaries. She joined GandhiJi in his fight for freedom. After India's independence, Kamaladevi was offered a Cabinet post and other high offices. She declined and chose to dedicate her life to social service and rehabilitation of refugees.

The India-Pakistan partition was the largest migration of people in the history of the world. The helpless migrant's identities were reduced to "refugees". Healing, and not just the rehabilitation, was the need of the hour. Only someone with deep empathy, vision and perseverance could accomplish this mountainous task. Kamaladevi stepped in and started volunteer groups who would visit the refugee camps, talk with women and listen to their stories. Long before the western world formalized "art therapy", women in refugee camps were given sewing machines, knitting yarn, embroidery threads. Their delicate phulkari embroidery with silken unwoven threads of deep yellow, purple, green evoked the lush fields of mustard, happy

songs and community. The work helped bond the women together, stitch by stitch, the women's lives began to be woven back. Kamaladevi also helped the refugee men in various ways.

With industrialization, new factory products were coming into markets. Kamaladevi could foresee the inevitable slow demise of our folk arts and cottage industry, and along with that the end of livelihood for many village women. She was also acutely aware that in folk arts and handicrafts lies the soul of a culture —its nuances and complexity, its history, religion and mythology. It's a thread that runs from the past to the present. With strong determination to save the cottage industry, she started a small office in New Delhi's Janpath road, what is today the thriving and world-renowned center known as the Central Cottage Industry Located in the heart of Connaught Place, Cottage Industry Emporium has branches all over India. These products are authentically appealing, eco friendly, and representative of the vast multitudes, many regional cultures and talents that abound in our colorful India. The Emporium's logo is a terracotta Bankura Horse from Bishnupur, West Bengal — a famous destination for Indian crafts. Kamaladevi's vision, hard work and foresight changed and shaped the world of artisans in India. She was duly honored by UNESCO Award for the Promotion of Handicrafts in 1977.

Central Cottage Industries Emporium
Central Cottage Industries Corporation of India Ltd.
(A Govt. Of India Undertaking Ministry Of Textiles)

Kamaladevi's soul was in arts and theater. In her time, no respectable women worked in theater much less in films. Kamaladevi, always ahead of her times and courageous, acted not only in theater but in films as well. One of her better-known films is Tansen with K.L. Saigal. She started the prestigious Sangeet Natak Academy and National School of Drama. Many notable artists of today got their training at these institutes. Kamaladevi was given numerous awards including the highest awards from the Academy for her tremendous leadership in popularizing, sharpening and above all making the arts an honorable profession. Kamaladevi was also instrumental in the building the International Center in New Delhi. She was honored with the Padma Bushan in 1955 and Padma Vibushan in 1987 by the government of India.

An ardent feminist, Kamaladevi embodied this in her life — she lived it before she preached it. Her life is her testimony. Kamaladevi was the first organizing secretary of All India Women's Conference, 1926-1927. In 1929, she attended the International Alliance of Women in Berlin. She spoke up for gender justice, prevention of child marriage, education of women and started the Lady Irwin College in New Delhi. Educated at Bards College, London, she traveled the world to propagate the case for India's independence. She came to the United States and saw the racial discrimination, the "Whites Only" signs displayed everywhere. She met with black leaders, clergy, stayed with American families and spoke with ordinary people about their experiences. Moved by the inhumanity of racial discrimination that was so prevalent in USA, Kamaladevi spoke with black Americans about Gandhiji's non-violent fight for freedom. This was long before Martin Luther King adopted this approach during the American civil rights movement. Based on her experiences in the U.S, Kamaladevi wrote the book, Uncle Sam's Empire in 1944. A prolific writer, she published a large body of work and books on varying topics but chose not to leave behind any of her diaries or personal papers. She passed away on October 29, 1988 in Bombay. On her 115th birth anniversary, she was honored by Google Doodle.

Kamaladevi Chattopadhyay was a sari-clad missionary, a visionary beyond her times. A liberal humanist solidly grounded in echoes of Indian life, multi-talented with the empathy of a mother and courage of a warrior. Our lives, and the world, is enriched and sustained by the likes of Kamaladevi! At her passing, the then President of India, Shri R. Venkataraman, summed a worthy tribute, "it is hard to use the word 'late' for Kamaladevi. She will always be a palpable presence."

We offer our sincere homage and gratitude to her! May Kamaladevi's indomitable spirit and selflessness guide generations to come.

অভিজ্ঞতা

ইন্দিরা ভাওয়াল

অভিজ্ঞতা শব্দটা মনে এলেই এর জুড়ি আরো দুটো শব্দ মনে পাশাপাশি এসে যায়, তা হলো ভালো এবং মন্দ। প্রত্যেক মানুষের জীবনে নানান রকম অভিজ্ঞতা থাকে। এটা ঠিক, কিছু কিছু মানুষকে বেশি মন্দ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? অনেক সময়েই তার কোন উত্তর মেলে না। মানুষ যদি মন্দ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বেশি যায় তাহলে সে হয়ত জীবনে অনেক বেশি সহনশীল হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে দেখা দেয়, "আর কত? কেন আমি? এর কোথায় শেষ?"

আজ আমি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্প লিখছি আপনাদের জন্যে।

বাবা, মা, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে এক সচ্ছল পরিবার। বাবা একটি বেসরকারি অফিসে কাজ করতো এবং মা গৃহবধূ। ছেলে মেয়ে দুজনেই ভালো লেখাপড়া করে। মেয়েটি খুবই সুন্দরী এবং হাসিখুসি। তবে একটা জিনিস সকলে লক্ষ্য করে যে মেয়েটি কোন কারণে যদি একবার হাসতে আরম্ভ করে তো থামতে চয় না। বাবা মা বকাবকি করতে থাকে, কিন্তু সে শোনে না। মাঝে মাঝে অকারণে হাসতে থাকে এবং বলে যে একটা হাসির কথা মনে পড়ে গেছে তাই হাসছে। তবে হাসলে আর দোষ কি? কাঁদছে তো না!! যাইহোক মেয়েটি দেখতে দেখতে নবম শ্রেণীতে ওঠে। একদিন বাবা মায়ের সাথে সে যায় একটা নাটক দেখতে। নাটক দেখে এসে এক অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে দিন রাত শুধু নাটকের কথা বলতে থাকে। অনেক কথা বলতে থাকে যার কোনও মানে নেই। বাবা এবং মা ভয় পেয়ে যায়। তারা মেয়েটিকে এক গৃহ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। তিনি পরামর্শ দেন এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখাতে। তাতে ধরা পড়ে যে মেয়েটির মস্তিস্কে কেমিক্যাল ইমব্যালেন্স ঘটেছে। নাটক দেখা একটা উপলক্ষ মাত্র।

চিকিৎসা চলে বেশ কিছুদিন। যাইহোক মেয়েটি ভালো হয়ে যায় । পড়াশোনা করতে থাকে। কলেজ শেষ হয়ে যায়। এর পর বাবা মা শুরু করে পাত্রের সন্ধান। কাগজের বিজ্ঞাপনের সুত্রে যোগাযোগ হয় অন্য শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে। ছেলেটি যেদিন মেয়েটিকে দেখে চলে যায় তার পর থেকে মেয়েটি বলতে থাকে যে সে ওই ছেলেটিকে বিয়ে করতে চায়। বাবা মা খুশী হয়। ওর ভাইও চিন্তা করে, যে করে হো্ক এই পাত্রের সাথেই বিয়ে দিতে হবে যাতে মেয়েটি ভালো থাকে।

খুবই সুন্দরী, মোটামুটি লেখাপড়া জানে, তাই পাত্র পক্ষের কোন অসুবিধা নেই। বেশ ঘটা করে বিয়ে হয়ে যায় তার। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস!! বিয়ের ছয় মাস বাদে দেখা দেয় আবার সেই রোগ, মস্তিস্কের কেমিক্যাল ইমব্যালেন্স। তার স্বামীর কোনও ধারণা নেই এই রোগের। বিয়ের সময়ে এই রোগের ব্যাপারে কোনও আলোচনা করেনি মেয়েটির পরিবার। কারণ তাদের মনে হয়নি যে এই রোগ আবার হতে পারে এতো বছর বাদে!! মেয়েটির স্বামীর পরিবার খুবই ভদ্র। তারা কোনও দোষারোপ না করে চিকিৎসার ব্যাবস্থা করে। ততদিনে চিকিৎসারও অনেক উন্নতি হয়েছে, তাই সহজেই সেরে উঠে মেয়েটি।

দু-তিন বছর বাদে জন্ম হয় একটি পুত্র সন্তানের। পুত্রটিকে নিয়ে মেতে উঠে তারা। মাঝে মধ্যে দু-একবার ওই রোগটা দেখা দিয়েছে মেয়েটি, আবার সেরেও গেছে। পুত্রটি পড়াশুনায় খুবই ভালো। তাকে নিয়ে খুব খুশি মেয়েটির পরিবার। জীবনের বাইশটা বছর কেটে

গেছে। ছেলেটি Master's এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। কতো আনন্দ সারা পরিবারে! তারা মনে করে যে এখন তাদের ছেলে একটা ভালো চাকরী করবে এবং সে নিজেই তার পাত্রী দেখে নেবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আবার!! যখন তাদের ছেলে নিজেকে তৈরি করছে নানান রকম কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে তখন সারা পৃথিবীতে নেমে এসেছে কোভিড-১৯ নামক এক কঠিন সংক্রামক ব্যাধি। সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে, পরীক্ষা, চাকরি, দোকান বাজার, অদ্ভুত এক পরিস্থিতি! ঘরে ঘরে এক অসহায় অবস্থা। কারোর কিছু করার নেই। কে কাকে দোষ দেবে জানে না। যে ছেলেটি স্বপ্ন দেখেছিলো কত কি করবে, সে জানে না এই মুহূর্তে সে কি করবে। দিনরাত শুধু পড়েই চলেছে, কারোর সাথে দেখা করতে চায় না, বলে সে চায় না কারোর সাথে কথা বলতে। তার মা ভয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে। ফোন ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই কারোর সাথে যোগাযোগ রাখার। বাড়িতে কারোর ফোন এলে শুনতে পাওয়া যায় ছেলেটির গলা, সে বলে চলে, চাই না আমি কারোর সাথে কথা বলতে। মেয়েটি আত্মীয় স্বজনদের বলে, কি করবো বলো তো? এতো ভালো পরীক্ষায় ফল করেও তো লাভ হল না কিছু!! এর কোন উত্তর নেই কারোর কাছে!! শুধু পরামর্শ দেয় যে ছেলেকে শুধু উৎসাহ দাও, বল শীঘ্র ভাল হবে বলে। আর তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যে ছেলেটির জীবনে যেন তার মায়ের মতন রোগ না আসে এই মহামারির ত্রাসে!!

এ কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছেলেটির পরিবারের আর আত্মীয় স্বজনদের!!

কেন? কার এবং কোন কর্মের ফল এটা? কেউ জানেনা এর উত্তর!! ভগবান মঙ্গল করুন – এই কামনা করি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক সারমর্ম

নিরঞ্জন তালুকদার

চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। পুরাণের গল্পগুলো রূপক, ইতিহাস নয়। রূপকের বর্ণনাগুলোকে আক্ষরিক ভাবে নিলে তাদের মর্ম বোঝা যাবে না। বরং তাতে অন্ধবিশ্বাস জন্মাবার সম্ভাবনা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বঙ্গানুবাদ (প্রকাশক: তারা লাইব্রেরী, কলকাতা) এবং ব্যাখ্যা (ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব প্রণীত সাধন-সমর) প'ড়ে যা বুঝেছি তাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করছি নীচে।

পুরাকালে রাজা সুরথ সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপতি হয়েছিলেন। পরে শত্রু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নিজের দেশে এসে কেবল সেখানকার অধিপতি হলেন। সেখানেও শত্রুদের আক্রমণের ফলে এবং দুষ্ট অমাত্যগণের দ্বারা অর্থকোষ ও অস্ত্রবল অপহৃত হবার কারণে তিনি রাজত্ব হারালেন। তখন তিনি মৃগয়ার ছলে ঘোড়ায় চ'ড়ে বনে চ'লে গেলেন।

সেই বনে মেধস্ মুনির আশ্রম দেখে রাজা সেখানে যান। সেখানে সমাধি নামে একজন ধনী বংশীয় বৈশ্যের সাথে রাজার পরিচয় হয়। সমাধির ধনলোভী স্ত্রী-পুত্রগণ তার ধন-সম্পত্তি দখল ক'রে তাকে বিতাড়িত করে। তারপর বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মনের দুঃখে তিনি বনে চ'লে আসেন, কিন্তু পারিবার ও বন্ধুদের কথা ভেবে ভেবে সেখানেও শান্তি পাচ্ছিলেন না। রাজাও তার অবর্তমানে রাজ্য কীভাবে চলছে ভেবে ভেবে শান্তি পাচ্ছিলেন না। দুজনে দুজনের কথা শোনার পর তারা একসাথে মুনির সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের কথা শুনে মুনি যা বোঝালেন তারই বিস্তারিত বর্ণনা চণ্ডীতে।

মেধস্ মুনির কথা আলোচনা করার আগে সুরথ রাজা (ক্ষত্রিয়) আর সমাধি বৈশ্যের ভূমিকার তাৎপর্য কী ভেবে দেখা যাক। দুজনেরই স্বভাবে রজোগুণের প্রাধান্য, যার প্রভাব তাদের কার্যকলাপে, যাতে প্রয়োজন দুর্ধর্ষতা-সাহসিকতার। একজন রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যজন বিষয়সম্পত্তি পেয়ে পরে তা হারান এবং তার জন্য অশান্তিতে আছেন। মনে হয় এতে ইঙ্গিত আছে যে জাগতিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী, এতে প্রকৃত শান্তি মেলেনা।

মেধাস্ মুনি দুজনকে বোঝালেন যে সংসারে মানুষ মোহগর্তে থাকে। দেবী মহামায়ার দ্বারা জগৎ মোহিত হয়ে আছে, আবার মহামায়াই প্রসন্ন হ'লে মোহ থেকে মুক্তি দেন। মুনি মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা ক'রে বোঝালেন যে মহামায়াই বিশ্বজননী। তিনি নিত্যা, বিশ্ব তাঁর স্বরূপ। তারপর মুনি বললেন দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মহামায়ার আবির্ভাবের কথা। তার মর্ম থেকেই বোঝা যায় যে শান্তির উপায় হচ্ছে সাধনা।

সাধনাকে পথের সঙ্গে এবং সাধককে পথিকের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় সাধনার পথে তিনটে বাধা যেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ। প্রথম বাধা মধুকৈটভ অসুরদ্বয়। এদের সরাতে না পারলে সাধনার পথে এগুনোই অসম্ভব। দ্বিতীয় বাধা মহিষাসুর এবং সাধানার শেষ পর্যায়ে বাধা অসুর শুম্ভ। চণ্ডীতে আছে এই অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা। চণ্ডীর রূপকে অসুর বলতে যা বোঝানো হয়েছে এবং অসুরবিনাশের অর্থ যা তাতেই রয়েছে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক সারমর্ম। তাই যুদ্ধের বর্ণনা বাদ দিয়ে ঐ তিনটে বাধা এবং বাধাকাটানো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক সারমর্ম - নিরঞ্জন তালুকদার

মধুকৈটভবধ

প্রলয়কালে জগৎ যখন জলময় ভগবান বিষ্ণু তখন যোগনিদ্রায় ছিলেন। সেঅবস্থায় মধুকৈটভ নামে দুই অসুর বিষ্ণুর কর্ণমল হ'তে সৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ব্রহ্মা তখন জাগদম্বা মহামায়ার স্তব করলেন। দেবী বিষ্ণুর চোখ, বদন, নাক, বাহু, হৃদয় ও বুক থেকে আবির্ভূত হয়ে বিষ্ণুকে নিদ্রামুক্ত করলেন। বিষ্ণু অনন্তশয্যা থেকে উঠে পাঁচ হাজার বছর ধ'রে অসুরদ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাজিত করলেন।

তখন মধুকৈটভ বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বিষ্ণু বর চাইলেন যেন মধুকৈটভদের বধ করতে পারেন। সমস্ত জগৎ জলময় দেখে তারা বলল "যেখানে জল নেই সেখানে আমাদের বধ কর"। 'তাই হোক' ব'লে বিষ্ণু তাদের মস্তকদ্বয় নিজজঘনে রেখে চক্রদ্বারা ছেদন করলেন।

মধুকৈটভবধের আধ্যাত্মিক মর্ম

মধুকৈটভ মানে জাগতিক নশ্বর, অসত্য জিনিসের প্রতি মোহ। এ মোহ কাটাতে না পারলে সত্যদর্শন সম্ভব নয়। মধুকৈটভবধ মানে সাধকের মনের মোহমুক্তি। মধুকৈটভবধের আগে বিষ্ণুর পাঁচ হাজার বছর ধ'রে যুদ্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে মোহমুক্তি সহজ নয়, তার জন্যে অনেক দিন ধ'রে চেষ্টার প্রয়োজন।

মহিষাসুরবধ

একশ বছর ধ'রে দেবাসুরে যুদ্ধ হয়েছিল। সেযুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত ক'রে মহিষাসুর স্বর্গের রাজা হয়ে বসল। স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত দেবতারা ব্রহ্মাকে অনুসরণ ক'রে বিষ্ণু ও শিবের কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বদন হ'তে এবং দেবতাদের শরীর হ'তে তেজরাশি বেরিয়ে এক জ্যোতির্ময়ী নারীরূপ ধারণ করল। এভাবে আবির্ভূত হ'য়ে জগজ্জননী দেবী চণ্ডিকা (দুর্গা, মহামায়া) দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। অসুরসেনারা নিপাতিত হবার পর মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দেবীদ্বারা নিহত হ'ল।

মহিষাসুরবধের আধ্যাত্মিক মর্ম

রজোগুণের বশে মানুষের মনে কামনা, ক্রোধ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অসুরপ্রবৃত্তিগুলোর প্রাধান্যই মহিষাসুরের স্বর্গের রাজা হওয়া। রজোগুণের অন্তর্মুখী মঙ্গলজনক প্রভাবগুলোই দেবতারা। মনের জগতে দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে অবিরত। মহিষাসুরবধের অর্থ হ'ল কামনা, ক্রোধাদি অসুরপ্রবৃত্তির দমন (রিপুদমন)। মানুষের জীবনে রিপুদমন সম্পন্ন না হ'লে প্রকৃত শান্তি আসেনা।

মাদুর্গার মহিষাসুরবধের সঙ্গে রামচন্দ্রের রাবণবধ এবং পাণ্ডবদের কৌরববিনাশের তুলনা ক'রলে দেখা যায় যে রূপকগুলো আলাদা হলেও তাদের আধ্যাত্মিক

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক সারমর্ম - নিরঞ্জন তালুকদার

মর্ম একই - রিপুদমন। রাবণবধের আগে রাম মাদুর্গার অকাল-বোধন করেছিলেন শরৎকালে। সেই থেকে শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রচলিত, যদিও সুরথ রাজা দুর্গাপূজা শুরু করেছিলেন বসন্তকালে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হবার আগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন দুর্গার আরাধনা ক'রতে।

শুম্ভবধ

শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয় ত্রিলোক অধিকার ক'রে নিলে দেবতারা বিষ্ণুমায়ার (দুর্গার) স্তব করলেন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমোনমঃ" ইত্যাদি। বুদ্ধিরূপে ছাড়া আর যেসব বিভিন্ন রূপে সংস্থিতা ব'লে দেবীকে প্রণাম জানানো হ'ল তা হচ্ছে নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা,ক্ষান্তি (ক্ষমা), জাতি (উৎপাত্তি), লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি,স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ ও ভ্রান্তি। দেবী আবির্ভূত হয়ে যুদ্ধ ক'রে নিশুম্ভ ও শুম্ভকে বধ করলেন।

শুম্ভবধের আধ্যাত্মিক মর্ম

যে অজ্ঞানতার বশে সাধক আমিত্বকে নিজের সত্তা ভাবেন সে অজ্ঞানতাকে দূর করাই শুম্ভবধ। শুম্ভবধ মানে সাধকের উপলব্ধি করা যে নিজের আসল সত্তা হ'ল আত্মা যা নিত্য ও মুক্ত।

বেদান্ত অনুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। চণ্ডীর মহামায়াই বেদান্তের ব্রহ্ম।

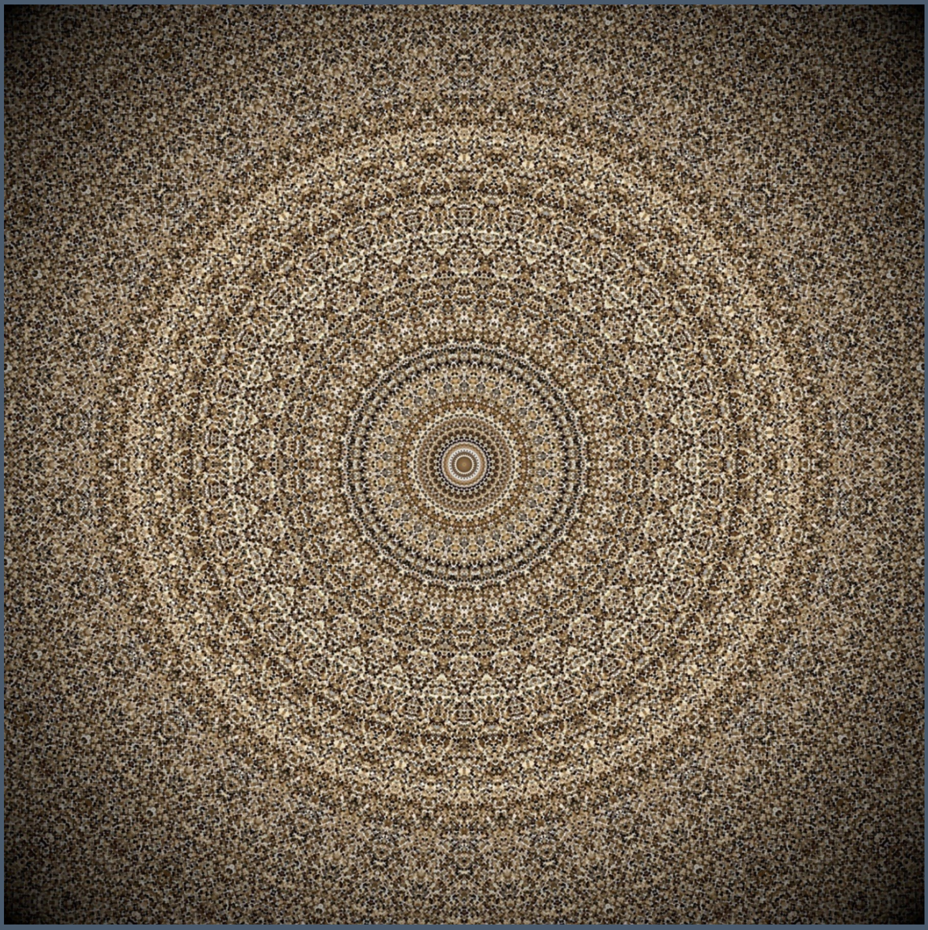

বারো মাসে তেরো পার্বণ

রীণা দত্ত চক্রবর্তী

ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়লে তার সঙ্গে মনে পড়ে লাল মাটির মেঝে, টানা বারান্দার চিক, জানলার কাঠের খড়খড়ি দেয়া পাল্লা আর মাঝের বসবার ঘরের লাগোয়া ঠাকুরঘর। রোজ সকালের চায়ের টেবিলে বসার সময় একটা গন্ধ পেতাম। কর্পূর, চন্দন, আর ধুপ মেশানো একটা গন্ধ। তখন তো পুজো বলতে শুধু ওই দুর্গাপুজো ছিল না। প্রায়:শই কিছু না কিছু লেগেই থাকতো। কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।

নামাবলী গায়ে বুড়ো ঠাকুরমশাই আসতেন আর তিনি মারা যাবার পর তাঁর নাতি দুলাল। এখনো মনে পড়ে ঠাকুমা একটা বেতের মোড়া নিয়ে বসতেন আর পেছন থেকে এই নতুন পুরোহিতকে বকুনি লাগাতেন কিছু ভুলে গেলেই।বাড়ির ছোটদের লাগিয়ে দেয়া হত আলপনা দেয়া, মালা গাঁথা, অঞ্জলির ফুল ছেঁড়া, দূর্বা বাছা ইত্যাদিতে। একটু বড় হলে বায়না করতাম ফল কাটব বলে। কাঠের বারকোশে, কাঁসা-পেতলের বা পাথরের থালায় সাজানো হত নৈবেদ্য, রাখা হত কোশাকুশি আর লাল ও সাদা চন্দন।সেই দিনগুলোর মতোই হারিয়ে গেছে সেই বাড়ির পুজোগুলো আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছোট ছোট আনন্দগুলো।

পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন। দুর্গাপুজো আর জন্মদিন বাদ দিলে নতুন জামা-কাপড় পাওয়ার এইদিন ছিল সুবর্ণ সুযোগ। বাংলা ক্যালেন্ডার ও মিষ্টির বাক্স আসত পাড়ার দোকান থেকে হালখাতা উপলক্ষে। সেই ইংরিজি ও বাংলা ক্যালেন্ডারের কিন্তু চাহিদা ছিল প্রচুর। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ষষ্ঠী, ইত্যাদি সেখানে লেখা থাকায় প্রতিনিয়ত পঞ্জিকা খুলতে হত না।

এই বৈশাখে হত অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত। ভারী মজা লাগত যখন গাড়ি করে যাওয়া হত মাটির কলসী কিনতে। এখনো মনে আছে ঠাকুমা পাঁচটি কলসী বসাতেন প্রয়াত পিতৃপুরুষ ও গুরুদেবের নাম করে। পাঁচ থালায় সাজানো হত চাল, ফল, নানা প্রকারের মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য। সকাল থেকে উপোস করে এই কলসীতে জল

কেন দেয়া জিগ্যেস করলে ঠাকুরমশাই বলতেন এতে সূর্যলোক গমনের ফল পাওয়া যায়। সেই ফল পাওয়া যায় কিনা জানিনা তবে ওই পুজোর প্রসাদের ফল ও মিষ্টি ছিল বড়ই সুস্বাদু।

এই বৈশাখেই পড়তো বুদ্ধপূর্ণিমা। বাড়ীতে আলাদা করে বুদ্ধমূর্তি না পুজো হলেও এইদিনের একটা নিজস্ব সন্মান ছিল। আমার বাবার পিসীর বাড়িতে পালন হত সত্যনারায়ণ পুজো। সন্ধেবেলা বাড়িতে পৌঁছে যেতো সিন্নি। এই সিন্নি মাখাটাও ছিল আমাদের কাছে বেশ অবাক কান্ড। যে সিন্নি মাখবে সে মাখাকালীন কথা বলতে পারবে না অথচ যা যা লাগবে সেটা নানারকমের ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিত।

তারপর অরণ্য-ষষ্ঠী যা জামাই ষষ্ঠী নামে প্রত্যেক শ্বশুরবাড়িতে ত্রাহি ত্রাহি রব ফেলত। সেদিন বাজারে সব জিনিসের দাম আগুনছোঁয়া।ইলিশ, আম নিয়ে লেগে যেত দর কষাকষির যুদ্ধ। খাওয়ার ফর্দের কথা বলা বাহুল্য কিন্তু জামাইকে পাখা করার জন্যে আসত নতুন হাতপাখা। মজার কথা হলো পাখা কেবলমাত্র নতুন হলে

চলবে না, সেই নতুন পাখা দিয়ে মা ষষ্ঠীর বাহন বেড়ালকে হাওয়া করে নাকি তবে জামাইকে হাওয়া করা হত। এইটা কিন্তু চোখে দেখা নয় কেবলমাত্র গল্পশোনা। শুনে ভাবতাম আচ্ছা বেড়াল যদি ধরা না পড়ে বা পাখার হাওয়া না খেতে চায়ে তাহলে কি উপায়?

এসে পড়লাম আষাঢ় মাসে, বৃষ্টি, রথযাত্রা, আর পাঁপড়-ভাজার দিনে। স্কুল ছুটি। সকালে গুদামঘর থেকে বার করা হত কাঠের রথ। ঝেড়ে মুছে এবার তাকে সাজানোর পালা। নিয়ে আশা হত দেওধর পাতা, আম পাতা, বেলফুলের মালা, মাটির ঠাকুর আর সোনালী-রূপালী কাগজ।সন্ধে বেলা পুজো করে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে তবে রথ টানা, সাবুর পাঁপড় -গজা ইত্যাদি খাওয়া, রথের মেলা দেখতে যাওয়া- সেখানে বাঁশী কেনা, মাটির খেলনাবাটি কেনা, নাগরদোলা চড়া । এরপর গুরু-পূর্ণিমা যার আরেকটি নাম ব্যাস-পূর্ণিমা। কথায় আছে এইদিন বেদ ভাগ হয়েছিল ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, এবং অথর্ববেদে।

এসে গেল শ্রাবণ মাস আর ঝুলন । রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা উপলক্ষে চন্দনকাঠের দোলায় বসানো হতো তাঁদের মূর্তি। মালা দিয়ে সাজিয়ে, প্রসাদ রেখে সেই দোলনা টানা হত। এরপর পালন করা হত রাখী-পূর্ণিমা। রবীন্দ্রনাথ নতুন করে রাখী বন্ধনের প্রথা চালু করেন বাংলা বিভাজনের প্রতিবাদে। নিজের ভাই ছাড়াও বন্ধুদেরও রাখী বাঁধার চল ছিল। ঠাকুমা রাখী বাঁধতেন বালগোপালের হাতে তারপর সব নাতি-নাতনীকে। সেদিন সারা কলকাতা শহরে লাগত হাতে তৈরী বা কেনা রাখীর রঙ। এর কিছুদিন পরে আসত জন্মাষ্টমী। ঠাকুরমশাই এসে গোপালকে চান করিয়ে পরিয়ে দিতেন নতুন জামা, গয়না, আর মাথায় মুকুট। সকালের প্রসাদের জন্যে নিয়ে আসা হত কলাপাতায় মোড়া সাদা ননী, মিছরি, আট-কড়াই, তিলকুট, ও কদমা। অতি আবশ্যক ছিল গোটা তাল এবং তালের বড়া। সন্ধের প্রসাদে ডালপুরী, মিষ্টি, নারকোলের নাড়ু, আর গুড়ের বাতাসা।

ভাদ্র মাস মানেই শরতের আভাস, দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরী, বাজারে ভিড় আর নীল আকাশে নানা রঙের ঘুড়ি। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পাড়ার ছাদ থেকে ছাদে শোনা যেত ভো-কাট্টা! তার আগের দু দিন ধরে চলত ঘুড়ি কেনা, সুতোয় মাঞ্জা দেয়া, আর কে ওড়াবে আর কে লাটাই ধরবে তা নিয়ে মান -অভিমান। প্রত্যেক

কারখানায়, গ্যারাজে হতো রীতিমত ঠাকুর বসিয়ে পুজো, যন্ত্র-পুজো আর পরিশেষে মাংস ভাত খাওয়া।

এই মাসেই অরন্ধন সংক্রান্তি বা রান্না পুজো হত বাড়ি বাড়ি। বাড়ির ভেতরে হত লক্ষ্মীপুজো। আগেরদিন সব রান্না করে রাখা হত এমন খাবার যা না গরম করেও খাওয়া যাবে কারণ রান্না পুজোর দিন পড়ত রান্নাঘরে তালা। বাড়ির বাইরে করা হত মনসা দেবীর পুজো। সাতটি বাটিতে দুধ রাখা হত সাত সাপের উদ্দেশে।

এরপর মহালয়া দিয়ে শেষ পিতৃপক্ষের আর শুরু বাঙালীদের সেরা উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। এই নিয়ে আর আলাদা করে বলার কিছু নেই। অতিমারীর প্রকোপে এই প্রবাসী জীবনে দুর্গাপুজো না হওয়া যে কি মর্মান্তিক তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব না।মা দূর্গা এলেন বাপের বাড়ি সঙ্গে চার পুত্র-কন্যা। বধ হল মহিষাসুর। মেতে উঠল বাংলার শহর থেকে গ্রাম। অষ্টমীর অঞ্জলি। সন্ধি পুজোর আরতি। সিঁদুর-খেলা আর ঢাকের আওয়াজ। দুর্গাপুজোর পরের লক্ষীপুজোকে বলা হয় কোজাগরী লক্ষীপুজো। সেদিন সারারাত জ্বলত ঠাকুরঘরে প্রদীপ। আগেকার দিনে শুনেছি ছিল পালা করে রাত জাগার প্রথা।

কার্তিক মাস মানেই ভূতচতুর্দশী, কালীপুজো আর ভাইফোঁটা। বলতে কি দুর্গাপুজো থেকে ভাইফোঁটা এইসময়ে পুজোর ছুটি তাই পুরো সময়টাই কেটে যেত মহানন্দে। কালীপুজোর আগে বাড়িতে বাজী রোদে দেয়া, তুবড়ি, রংমশাল বাঁধা, ভূত চতুর্দশীর দিন ১৪ প্রদীপ জ্বালা, ১৪ শাক খাওয়া সে সব এখন গল্পকথা। ভাইফোঁটার পর ছট পুজো যদিও তা ঠিক বাঙালদের পুজো নয় তবে কলার কাঁদি, ঘড়ায় জল নিয়ে কত লোক যেত রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে।

অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পুজো।দেবী শক্তির আরেক রূপ, বাঘ তাঁর বাহন এবং কারিন্দ্রাসুর বধ করেন তিনি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সর্বপ্রথম সার্বজনীন ভাবে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। এখনো কৃষ্ণনগর, হুগলি ও চন্দননগরে জাঁকজমক সহ এই উৎসব পালন করা হয়। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি প্রতি রবিবার হয় ইতুপুজো। এর উৎভব আগামী শীতের প্রকোপ থেকে শস্যের রক্ষা হলেও ইতু শব্দের উৎপত্তি মিতু অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সূর্য। তাই প্রধানতঃ এটি সূর্য্য পুজো যা পুটুলি আঁকা ঘটে মধ্যে শস্য ও তৃণ দিয়ে পুজো সম্পন্ন করা হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিনে।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি মানে পিঠে পার্বণ ও উত্তরায়ণের শুরু। এই দিন বাড়ির দরজায় দরজায় বাঁধা হত ধানের কড়। নতুন চালের পায়েস ও পিঠে তৈরী করে, নতুন গুড় দিয়ে ঠাকুরঘরে প্রসাদ দেয়া হত। সংক্রান্তির দিন ভিড় হত গঙ্গার ঘাটে আর বসত গঙ্গাসাগর মেলা। শান্তিনিকেতনেও এই দিন পৌষ মেলা পালন হয় ধুমধাম করে।

মাঘ মাসে সরস্বতী পুজো।এইদিন ছিল পড়াশোনার হাত থেকে একদম ছুটি। বাড়িতে পড়ুয়া ছেলেপুলে থাকলে সরস্বতী পুজো বাঁধাধরা, তা সে মূর্তি এনেই হক বা ঘটে বসিয়ে।তা ছাড়া স্কুল- কলেজে তো পুজো হতই । প্রসাদের মধ্যে অতি আবশ্যক ছিল নারকেল কুল আর টোপা কুল। পুজোর আগে কুল খাওয়া ছিল একদম নিষেধ। ভয় দেখানো হত যে আগে কুল খেলেই নাকি পরীক্ষায় ফেল। ব্যক্তিগত অনুভব থেকে বলতে পারি মা

সরস্বতী কিন্তু লোভে পড়ে কুল খেয়ে ফেললেও খুব একটা রাগ করতেন না। সরস্বতী পুজোর পরের দিন শীতল ষষ্ঠী। ঐদিনকে গোটা ষষ্ঠীও বলা হয়। পঞ্চমীর দিন গোটা মুগ ওর ছয়টি করে গোটা আলু, বেগুন, রাঙালু, গোড়া শুদ্ধু পালং শাক, জোড়া কড়াইশুঁটি ও জোড়া শিম সেদ্ধ হত। সঙ্গে সজনেফুল ভাজা। তারপর ষষ্ঠীর দিন ঠান্ডা সেই সেদ্ধ খাওয়া। মায়েরা খেতে বসলে আমাদের হাতে পাখা দেয়া হত। পাখার হাওয়া করতে করতে জিগ্যেস করতে হত 'কি খাচ্ছ মা' আর উত্তর আসত "শীতল হাওয়া"।

ফাল্গুন মাসে মহা শিবরাত্রি। সেদিন নির্জলা উপবাস। শিবঠাকুর কিন্তু অল্পে খুশি। বেলপাতা, চন্দন, আর গঙ্গাজল দিয়ে ঠাকুরস্নান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাত জাগা। যদিও এখন সে সব প্রায় উঠে গেছে আগে কিন্তু সবাই রাতে জেগে থাকত। গল্পকথায়ে বলত যে ঘুমিয়ে পড়লে শিবঠাকুর এসে পা টিপে দেবেন আর সে মহাপাপ। মাঝে মাঝে ভাবি নিয়মকানুনের ভয়ে দেখিয়ে জীবনের কত সময় পার হয়ে গেছে।

চৈত্র মাসে প্রথমে চাঁচড় আর দোল-পূর্ণিমা। দোলের আগের দিন পাড়ায় পাড়ায় জ্বলত আগুন আর পোড়ানো হত আবর্জনা। দোল এর কথা আর আলাদা করে এমন কিছু বলার নেই। সকালে প্রসাদ দেয়া হত মঠ দিয়ে। তারপর ঠাকুরের পায়ে ছুঁয়িয়ে, গুরুজনদের প্রণাম করে তবে আবির খেলা, বালতিতে রং গোলা আর পিচকারি। কি আনন্দে কাটত সারাটা দিন। দোলের পরে নীল ষষ্ঠী। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মহাদেব। প্রদীপ, পৈতে, ধুতরা ফুল, আকন্দের ফল উৎসর্গ করা হত। ডাবের জল, মধু, দুধ, চিনি, ঘি ও দই দিয়ে শিবকে চান করানো হত। গাঁথা হত আকন্দ ফুলের মালা। এরপর মাসের শেষে চড়ক সংক্রান্তি। বসত চড়কের মেলা। সে ভারী মজা। সেদিন সং বেরোত রাস্তায় রাস্তায়। নানা জায়গা থেকে নানান সাধু সন্ন্যাসী আসতেন মেলায়। কেউ বসতেন লোহার পেরেকের ওপর কেউ বা হাঁটেন জ্বলন্ত কয়লার ওপর কারো বা জিভে গাঁথা লোহার শলাকা। কি বিচিত্র সাধনা। চড়ক সংক্রান্তির দিন খাওয়া হত ছাতু মাখা। এই সংক্রান্তির থেকেই বাঁধা হত তুলসী গাছের মাথায় ঝারা বা ধারা| একটা ফুঁটোওলা পেতলের ছোট ঘটি যার গর্তে দেওয়া হত দূর্বা যাতে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে। এটি থাকত পুরো বৈশাখ মাসের শেষ অব্দি। রোজ সকালে ছাতে গাছের গোড়ায় ধুপ দিয়ে, পেতলের কলসিতে জল ভরে বাতাসার লুঠ দেয়া হত।

দেখতে দেখতে এক একটা বছর পেরিয়ে যেতে যেতে কবে যেন পৌঁছে গেছি সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে। মনে থেকে গেছে অতীতের ছায়া যা আমরা বাঙালিয়ানা হিসেবে বড় আপন করে রেখে দিয়েছি স্মৃতিপটে। বারো মাস আজ আছে শুধু খুঁজে পাইনা ওই তেরো পার্বণ।

বাঙালিয়ানা

তদস্তু হৃদয়ং মম

জয়শ্রী চৌধুরী

"যদেতদ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম ,তদস্তু হৃদয়ং তব। "

তোমার এই হৃদয় আমার হোক ,আমার এই হৃদয় তোমার হোক। সনাতন হিন্দু বিবাহে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয় বিবাহ বাসরে, যার তাৎপর্য দুটি হৃদয়কে সামাজিক বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত করার সাথে সাথে একে ওপরের কাছে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়াও।
"বিবাহ" শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে "বিশেষ ভাবে বহন করা" । বিয়ে শব্দটি এসেছে বিবাহ থেকেই। বাঙালি সমাজে দুটি হৃদয়ের বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার

অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র ও নিয়মাবলীর সাথে সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে কিছু লোকাচার বা স্ত্রীআচার ও। কথায় আছে না "যার বিয়ে তার খোঁজ নেই , পাড়াপড়শির ঘুম নেই ।" কথাটা শুনতে যাই হোক না কেন , একসময় তা কিন্তু ছিল কিছুটা হলেও বাস্তব। আগেকার দিনে এই স্ত্রী আচার গুলোতে পরিবারের মহিলারা ছাড়াও পাড়া প্রতিবেশী মহিলারা সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন, এ ছিল তাদের জন্য একরকমের বিনোদনের ব্যবস্থাও। এই স্ত্রী আচার গুলো অঞ্চলভেদে কিছু টা ভিন্ন।পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বিবাহের আচার গুলোর মধ্যে কিছু তফাৎ থাকলেও গায়ে হলুদ, দধিমঙ্গল, অধিবাস,শাঁখা-
পলার অনুষ্ঠান,সিঁদুরদান,মালাবদল,সপ্তপদী ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান গুলো দুই বঙ্গেরই বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমন ই কিছু বাঙালি বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ও তাৎপর্য্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই লেখার মাধ্যমে।

উলুধ্বনি : হিন্দু বাঙালিদের কোন শুভ বা মাঙ্গলিক উলুধ্বনি ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না। কথায় আছে উলুধ্বনির ফলে যে কোনো মাঙ্গলিক কাজ দেবতাদের আশীর্বাদে আরও মঙ্গলজনক হয়ে ওঠে। উলুধ্বনির কম্পনে পরিবেশ পবিত্র ও জীবাণুমুক্ত হয়।

গায়ে হলুদ : এই রীতিকে গাত্র হরিদ্রা ও বলা হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গের বিয়েতে দু বাড়িতেই গায়ে হলুদ হয় বিয়ের দুদিন আগে আদৃস্নান ও অধিবাসের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত বিয়ের দিন সকালে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। কাঁচা হলুদ প্রাকৃতিক ভাবে জীবাণু নাশক। শরীরকে পরিষ্কার রাখতে ও ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে হলুদ। প্রাচীন ভারতে রূপচর্চার প্রাকৃতিক উপাদানের এক অন্যতম ছিল এই হলুদ। মূলতঃ এই কারণগুলোর জন্যই হলুদ বিয়ের এক অন্যতম উপাদান।

তত্ত্ব : বাঙালি বিয়ের হাজারো নিয়ম কানুনের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিয়েতে আরেকটি আকর্ষণীয় প্রথা হল তত্ত্ব সাজানো । বিয়েতে বর ,কনে সাথে নিকট আত্মীয় স্বজনের জন্য যে উপহার সামগ্রী দু বাড়িতে আদান প্রদান হয় একেই তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব সাজানো ঘিরে চলে বিয়ের অনেক দিন আগে থেকেই নানা রকমের পরিকল্পনা। এ তো শুধুই উপহার দেওয়া নেওয়া নয় , সম্পর্কের বন্ধন ও দুই পরিবারের রুচিবোধের পরিচয় ও বটে।পরিবারের সদস্য ছাড়াও প্রতিবেশী দের সৃজনশীলতায় এক বিশেষ রূপ পায় এই উপহারসামগ্রীর ডালা।আগেকার দিনে এই ডালা গুলোতে লিখে দেওয়া হতো মজার মজার ছড়াও। বিয়ের দিন সকালে বরের গায়ে ছোঁয়ানো হলুদ পিতলের বা রুপোর বাটিতে করে , সাথে কনের এবং তার আত্মীয় স্বজনের জন্য তত্ত্ব যায় বরের বাড়ি থেকে।গায়ে হলুদের তত্ত্বের আরেকটি প্রধান বস্তু হল মাছ এবং মিষ্টি। খুব সুন্দর করে গোটা মাছ কে সাজানো হয় নববধূর মতো করে আবার কখনও দুটো মাছ কে বর বধূ বেশে, মাছের উপরে দেওয়া হয় সিঁদুরের ফোঁটা।বাঙালী বিয়ের সকল আচার অনুষ্ঠানে মাছ মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে মানা হয় ।বংশবৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক মাছ। ফুলশয্যার দিন এমন ভাবেই আবার কনের বাড়ি থেকে সাজানো তত্ত্ব যায় বরের বাড়ির জন্য। পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে গায়ে হলুদের তত্ত্বের প্রথা না থাকলেও "মঙ্গলাচরণ" ও " অধিবাসের " তত্ত্ব যায় বরের বাড়ি থেকে।

পানখিলি : বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধান ,দূর্বা ,পান, সুপুরি ও মাছ ব্যবহার করা হয়। বলা যায় এইসব কিছুই বংশবৃদ্ধির প্রতীক। পূর্ববঙ্গে এই পান সুপুরি দিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয় "পানখিলি ", এয়োস্ত্রী রা মিলে পানের খিলি বানিয়ে তাতে বাঁশের বা সোনা রুপোর কাঁঠি গুঁজে তুলসীতলা, মন্দির এরকম পাঁচ জায়গায় অর্পণ করে আসেন। বিবাহ তো বটেই , সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই পান সুপুরির গুরুত্ব অপরিসীম।

জল ভরা : এই স্ত্রী আচার গুলোর মধ্যে আরেকটি হলো "জল ভরা " বা জল সইতে যাওয়া। বিয়ের দিন এবং অধিবাসের দিন বর-কনেকে স্নান করানোর জন্য এয়োস্ত্রীরা বেজোড় সংখ্যায় জল আনতে যান পার্শ্ববর্তী জলাশয় থেকে। জল সইতে যাওয়ার সময় গ্রাম বাংলার মেয়েরা গেয়ে থাকতেন অনেক গান যা কোথাও বা বলা হতো "গীত ".

দধি : যে কোনো শুভ কাজ ও অনুষ্ঠানে দধি একটি মঙ্গলসূচক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় আর এর খাদ্যগুণ ও অনেক। বাংলায় বিয়েতে তাই দধিমঙ্গল একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। আশীর্বাদের অনুষ্ঠানের দিন থেকে শুরু হয়ে দধির ব্যবহার হয়ে থাকে যাবতীয় অনুষ্ঠানে।

সাজসজ্জা : বিয়ের দিন বরের হাতে থাকে দর্পন আর কনের হাতে থাকে গাছ কৌটো। এর মধ্যে থাকে রুপোর একটাকা। অনেক বাড়ির নিয়মে হাতে ওঠে কাজল লতা।

পূর্ব বঙ্গের কিছু অঞ্চলের বাঙালি বিয়েতে ,বিয়ের দিন সকালে স্নানের পর বর কনের হাতে দেওয়া হয় "ধুতুরা কাটাইল" যা কলার ভিতরের অংশ, ধুতুরাপাতা, সরিষা, ধুপ, দুর্ব, দিয়ে বাঁধা থাকে। প্রতিটি জিনিসই সৌভাগ্য ও সুরক্ষার প্রতীক।

বিয়েতে কনের হাতের "শাঁখা -পলা ও নোয়া " এক

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অধিবাসের দিন কনেকে শাঁখা -পলা পরানো হয়. বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই তিনটি হচ্ছে সত্ত্ব ,রজঃ ও তম গুনের প্রতীক।

বরণ :বাঙালি বিয়ের আরেকটি খুব সুন্দর আচার হচ্ছে "বর বরণ " ও " বধূ বরণ ". আর তার জন্য সাজানো হয় বরণডালা।অঞ্চলভেদে বরণডালা সামগ্রী হয়তঃ কিছুটা ভিন্ন হয় কিন্তু প্রদীপ, ধান দুর্বো , মিষ্টি সবজায়গার বরণডালা তেই লক্ষ্য করা যায়।এই গুলো সব শুভশক্তির প্রতীক। এই বরণের সময় পূর্ববঙ্গে রেওয়াজ আছে মাছের ছাঁচের ঘরে

বানানো সন্দেশ বর -কনেকে খাওয়ানোর।
ঘী এর প্রদীপ জ্বালিয়ে নববধূর মুখ দেখে বরণ করে ঘরে তোলেন বরের মা। দুধে আলতায় পা ডুবিয়ে নববধূ পা রাখেন তাঁর নুতন সংসারে। নববধূ কে গৃহলক্ষ্মী রূপে বরণ করে তোলার এই প্রথা সত্যি অভিনব।

সপ্তপদী : বাঙালি বিয়ের প্রধান অংশ হলো সপ্তপদী বা সাতপাঁক। এই সাতপাঁকে আবদ্ধ হওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হন একে অপরের কাছে। সপ্তপদীর সময় পানপাতায় ঢাকা থাকে কনের মুখ. প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় এই পান পাতায় আছে অনেক দ্রব্য গুন্ ও ওষধি গুন্। পূর্ববঙ্গের এই সপ্তপদী হয় বিশেষ করে বানানো সুসজ্জিত কুঞ্জের মাঝে। একটি বৃত্তের মতো বানিয়ে তাতে কলাগাছ পুঁতে , মালা, ফুল দিয়ে চারিদিক ঘিরে ,আর মেজে তে খুব সুন্দর আল্পনা দিয়ে বানানো হয় এই কুঞ্জ। পূর্ববঙ্গের বিয়েতে এই কুঞ্জ এক গুরুত্ব পূর্ণ ও দ্রষ্টব্য বিষয়। এই কুঞ্জ সাজানো ঘিরে আছে অনেক গান ও , তেমনি একটি " তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো , আজ আমার প্রান নাথ আসিতে পারে ".

মালাবদল , সিঁদুরদান : মালাবদল, সিঁদুরদান, সম্প্রদানের মাধ্যমে মূলতঃ সম্পন্ন হয় বিয়ের দিনের অনুষ্ঠান। হিন্দু বাঙালি বিবাহে দুজনে জীবনসঙ্গী হিসাবে অঙ্গীকার বদ্ধ হন এই আচার গুলোর মধ্য দিয়ে। সিমন্তে সিঁদুর এক প্রাচীন প্রথার একটি। লাল রং নবোদিত সূর্যের প্রতীক। সেই যে আরতি মুখোপাধ্যারের জনপ্রিয় গান " লাজে রাঙা হলো কোন বৌ গো" ,গানের কথার মতোই সিঁদুরদানের পর এক অপরূপ রূপের্ ঝিলিক দেখা যায় যেন কনে বৌ এর মুখে।

এই আচার গুলো ছাড়াও আছে বাসি বিয়ের অনুষ্ঠান, পাশাখেলা, সূর্য্যার্ঘ , বৌভাত, দ্বিরাগমন,আরও অঞ্চল ভেদে অনেক নিয়মনীতি। আগেকার দিনে বিবাহের অনুষ্ঠানে নিয়ম নীতির সাথে সাথে বিশেষ প্রাধান্য পেতো বাদ্য বাজনা ও গীত সঙ্গীতও ।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রাকে আমোদ প্রমোদে সচল ও প্রাণবন্ত রাখতে এই আচার গুলো ছিল একসময়ে অপরিহার্য্য। আজকের এই ব্যস্ততম নাগরিক জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অনেক আচার , নিয়মনীতি। সব কিছুই সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। কিন্তু এই হারিয়ে যেতে থাকা সংস্কৃতির তাৎপর্য্য যে অপরিসীম , তাই সবসময় আমরা এই আচার অনুষ্ঠান মেনে না চলতে পারলেও মনে রেখে চলার চেষ্টা তো করতেই পারি।

বাঙালিয়ানা

Gamcha : Revival of the Weave

Pratibha Goel

Part I (The Spark)

Our story started on a cold December morning of 2011, when Calcutta experienced its worst tragedy in decades. The AMRI Hospital fire was the worst of its kind in India, taking more than 80 lives. One of us was part of the rescue missions.

What we carried from that day is the power of doing, of getting up and going into the trenches to do what you think is right. We wanted to do this while entertaining our flirtations with photography and design. What followed was an art exhibition in our apartment to raise money for an NGO our grandfather was a doctor at. It went well, and we managed to raise enough to build much-needed infrastructure for them.

Part II (Gamcha)

After our first exhibition, we had the confidence to do more, and over the next few months we set-up in more spaces and associated with more people to bring about awareness of social causes we believed in. We did all this collaborating with local artists, artisans, dancers, musicians, creatives to put up event after event. We experimented with making household products, stationery, photo frames, accessories—all with the local fabric gamcha.

Gamcha is widely known and used as a towel in and around West Bengal, India. This was the humble towel we grew up with. It's something that was in households all over Bengal, but with the introduction of new material, was in decline. We wanted to do something about this. The gamcha story sets in when we met two weavers who shut shop as demand wasn't there. They sat in the clinic of the NGO (mentioned earlier) with coarse hands as labourers. They lost their craft, and that really hit us. They were artists

who were forced to let go of something that was in their family for generations. 145 East started as an initiative to revive a 'dying textile', promoting the textile through photography, films, graphic illustrations and compelling copy, and creating awareness about it.

Our co-founder, Shoma Badoni believes in making the products sustainable and eco-conscious, using, for the most part, a local fabric called gamcha. With this, we work to empower local artisans, craftsmen and weavers. Collectively, at every stage of design, we wish to revive the dying crafts of this age. In the end, give back to the community we inhabit and love.

As far as women are concerned in our production process, we aim to create a multitude of employ-

ment opportunities for them. Most of our designs are very simple, and can be performed with minimal effort- a thread and a needle. Wherein zero stitching skills or any other prior trainings are required. We are trying to create a space where women around the city find it convenient to engage with us directly, even from their households.

Future plans apart from making a presence with the revival of gamcha as a textile:

- Empower underprivileged women by teaching them skills for employment in small sector industries.
- Bring people together to create free/ subsidised healthcare for the underprivileged sections of the society
- Get handwoven textiles to the front lines so that the weavers and their voice back with the current generation.

145 East was born out a collection of the story of a college dropout, of a former architect, of a mother of two, of a grandfathers love, out of love for Calcutta, creativity, and of course, gamcha. We took this underdog fabric, from an underdog city, and pushed it to households all over India. We've pushed it into film, music, high fashion, and want to take it even further.

That's why we're now a full-service agency.

Part III (The Agency)

All of us who make up 145 East have had no prior training in the work that we're doing today.

Fresh eyes and sensibility gave us an edge to build a creative engine that is trying to put Calcutta back on the map. People leave this city for opportunities outside. We're trying to create a culture of film, music, design, art and commerce, all from the heart and soul of this city. We want to bring it back to the forefront of conversation. We want to bring Bombay, Delhi, Bangalore to Calcutta. And it's happening slowly.

Photo courtesy: https://www.the145east.com

বাঙালিয়ানা

Art and Development : The Story of Patachitra

Ananya Bhattacharya

Stories are intrinsic in Bengali ways of life. We have been growing up listening to the stories of *Thakumar Jhuli.* Our rituals and festivals are full of stories, from *Bratakatha* to *Laxmi Panchali* to folklores on appeasing gods and goddesses and destroying demons. Stories are woven in the *pallu* of ornate *Baluchari* sarees. *Kantha* embroidery is the vocabulary of Bengali women. A unique visual storytelling tradition of Bengal is *Patachitra.* The word *Pata* comes from the Sanskrit word *Patta* or cloth and *Chitra* refers to painting. All of those who have the last name of Chitrakar mean they are painters. The painters, known as *Patuas,* paint stories on paper and paste them together on recycled sarees, making scrolls ranging typically from 5 feet to 11 feet and sometimes even 20 feet. The Patuas sing the stories as they unfurl the scrolls. The songs are known as *Pater Gaan,* and they have been passed down orally through generations. The stories are from Hindu mythology and folklore. In the past, the Patuas used to go from village to village, singing the songs and displaying the scrolls to earn a living. Some of you may have heard of the song *"dinga bhasao sagore, sathire."* Most people do not know this is a *Pater Gaan* sung by the Patuas while narrating the story of Behula sailing with her dead husband.

Patachitra is a living heritage. This story is about the revival of Patachitra by the tradition bearers. The art form was languishing in the 1990s, and the number of artists had dwindled to less than a

score. Only one or two artists knew the songs. Most of the Chitrakars were earning from daily labor and had stopped painting. The largest hub of Patachitra is in Naya village in Paschim Medinipur. The village is around 3 hour drive from Kolkata. Since 2005, the Patuas of Naya have collaborated with Banglanatak.com, a social enterprise headquartered at Kolkata, to revive their art. The living heritages taught painting and songs to the young. The artists revived their tradition of making colors from fruits, flowers, leaves, and trees. They partici-

pated in fairs and exhibitions across the country and globe to share their art. Today Naya has transformed into a vibrant cultural hub. There are students, scholars and tourists visiting the village every day. The village looks like a fairyland with huts adorned with paintings in bold colors and strokes. At the center of the village is a community museum showcasing the scrolls by different artists. Since 2010, every November, the Patuas celebrate their tradition in the annual village festival POT Maya. Nowadays, the artists paint on contemporary themes and challenges such as protecting the environment and ensuring gender equality. Patachitra on 9/11 and Tsunami are very popular. The Patuas of Medinipur are followers of Islam. Their tradition of singing and painting about Hindu deities upholds the syncretism of Indian culture. When the Covid-19 pandemic jeopardized life across the world, the Patuas were also affected. They lost their avenues of income as exhibitions and fairs got canceled and footfall of tourists became nil. But the Patuas drew on Corona and sang how to prevent spread. They went around and built awareness. They shared videos of songs, and the posts went viral. There are 80 families at Naya, and Patachitra is their livelihood. In the past, men used to go around from village to village, but now women are giving leadership. Rani, Swarna, Jaba, and Monimala paved the path, and their footsteps are followed by Mamini, Sushma, Imran and others.

Another variant of Patachitra is Santhal Pata closely linked to the rituals of life and death of the Santhals, an indigenous community living in Purulia and neighboring districts. The painting style is simple and has minimal use of colors. Rarely, more than three colors are used in a frame. Lighter shades of the colors are used. Saffron, yellow, orange are made by pounding stones collected from neighboring hills. Green is made from leaves of flat pea, purple from Pui Metuli, pink from banyan flower, red from Phanimansha flowers, and yellow from Palash (Flame of the Forest) flowers! White is made from Kharimati (Fuller's earth) and blue from indigo. Black is made from soot. The Jadu Pata depicts the story of creation of the universe and the origin of the Santhals. The Yama Pala Pata depicts the Santhali perceptions of hell. Another popular theme is that of the tiger god or Baghut Bonga. The paintings include everyday activities like hunting, farming, pounding grain, etc. Apart from the narrative scrolls, there are symbolic traditions like the Chaksudhan Pata or Paralaukik Pata. This is practiced as part of a funeral ritual. When a person dies, a Patua visits the family of the deceased. The dead is depicted in square or rectangular panels. The eyes are drawn with charcoal and turmeric on a drawing of the deceased person. Majramura in Purulia is a hub of Santhal Patuas.

Cultural heritage is an asset for development.

The Story of Patachitra - Ananya Bhattacharya

বাঙালিয়ানা

Banglanatak.com has been working with artist communities like Patuas across Bengal for revival of their traditional skills. Today Bengal has 15 villages where the Government has supported development of folk art centers. Between November and March, the communities celebrate their art in village festivals. More than 300 artists have traveled across the globe showcasing their talents. Recognition and respect as an artist has led to empowerment. Health and education indices have improved along with quality of life. The artists, though severely affected by the pandemic and in some parts of the state by Amphan, have not despaired. They are harnessing the power of social media. They are offering online heritage education programs. They are nurturing their talents. Connect with them online or in person when you visit Bengal. Learn about their heritage and beautiful works of art. It will be a cherishing experience. The Patuas also make a wide variety of products like painted stoles and sari, decorative items, and painted trays and jewelry. Show off the painted stole you may have bought.

Photo courtesy: banglanatak dot com

বাঙালিয়ানা

Shunya Batik

Kartik Manna

Shunya, established on 15th August 2004, is located in a rural area near Mecheda, Purba Medinipur, West Bengal. It is an organization dealing with the manufacturing, marketing, and selling of handicraft products, mainly in Batik & Kantha stitch, through its own workshop. From the very beginning, Shunya's goal was to establish a new genre of Batik with the help of poor rural women. In less than two decades, Shunya has taken its Batik designs to another level. Unique concepts, appropriate color combinations, and creative eyes make the designs different and exclusive. Shunya has

changed and improvised its style of work systematically over the years and has become an epitome of extraordinary creations by this time. Today, Shunya is recognized as the number one Batik design development organization in India that has made an indelible impression in the fashion world by setting up its own identity through a new genre of Batik design.

Craft lovers identify Shunya's designs comprehensively as the designs are so unique and well known. Nowadays, people in and outside of India have become ardent well-wishers of Shunya. Shunya takes part in various exhibitions across the globe

and is regularly invited for attending aristocratic and classy exhibitions in various cities. Shunya is particularly proud of its humble beginning in a rural area and committed to serving the needs of craft lovers by providing an opportunity for poor village women to combine their means of livelihood with their passion for art. Shunya's desire to reach the

heart of every craft lover across the nook and corner of the country has recently been jeopardized by the COVID-19 pandemic situation. However, as exhibitions are postponed, Shunya has found a new way to connect with its fans and supporters through the online platform. Through our virtual

presence online, we are knocking at you and expecting to steal your heart and soul through our stunning and exceptional work. Today, many people are following Shunya's Batik technique to make their work more attractive. We are glad that we have become pioneers in setting some lofty standards in our area of work, but we seek your continuous blessing and encouragement to lead us to even greater heights.

<u>Testimonial from Dr. Chaitali Chattopadhyay</u>

I have always been an admirer of the rich handloom products found in various regions of India; this is something perhaps that I inherited from my mother. Naturally, I was very impressed with the exquisitely woven products made by the extraordinarily talented weavers of Shunya Batik. Shunya's products are an ideal fusion of both the ethnic and contemporary styles. Their unique designs, ethereal handcrafted techniques, superior quality fabrics, and perfect harmony of colors are woven into intricate pieces of art. Whether in their sarees, blouse pieces, stoles, or skirts, the theme of their work is built around their tapestry of geometric designs, natural forms, Indian folklore, and popular culture. It reflects the wide expanse of their imaginative power and great creativity.

The immense talent and diligence of Shunya's founder, Kartik Manna, has enabled this establishment to thrive as it helps many women artisans living in rural and impoverished areas gain financial stability. Shunya's team is committed to empowering women through extensive training in Batik and Kantha, allowing them eventually to put their skills into practice at the handicraft workshop. Mr. Manna and his associates have also provided support in every way to the rural community during the Covid-19 pandemic. They work together as a complete family, and this makes their work so special in every way. They are exceptional in their customer service, the presentation of their products, and their enthusiasm to deliver the very best to their customers. Although Shunya's products are mostly sold through exhibitions all over India, it has been forced to go online because of the pandemic. I cannot resist mentioning my last time online shopping experience with Shunya; the beautiful saree was delivered in such a profoundly artistic package that I was truly amazed by its attention to every detail. I would mince no words to enthusiastically recommend Shunya's work to all the craft lovers. By their constant strive towards perfection and genuine passion for their craft, the founder and his associates have transformed Shunya to Purna, leaving our hearts with a sense of fulfillment and complete satisfaction.

Photo courtesy: shunyabatik.com

বাঙালিয়ানা

আহারের কি বাহার!

রিমি পতি

বাঙালী ও তার আহার বিলাস সারা ভারতবর্ষে আজ এক কিংবদন্তী। খ্যাতির শিখরে অবশ্য বাঙালী এক লাফে পৌঁছতে পেরেছে এমন নয়। সাত ঘাটের জল অর্থাৎ পারস্য, পর্তুগিজ, চীনা, তুরকি, আফগান ইত্যাদি নানা রন্ধন প্রণালী ও খাদ্যাভাস এসে মিলেছে এই বাংলার তীরে। প্রাচীন যুগের কবি কালিদাস রসিকতা করে লিখেছেন, 'আশ্বাসঃ পিশাচো হপি ভোজনেন'। অর্থাৎ পিশাচকেও ভোজন দ্বারা বাগে আনা যায়। পিশাচের কথা জানা নেই, তবে বাঙালী রমণী সেই আদি যুগ থেকেই স্বামীকে এই এক অস্ত্রে কাবু করে আসছেন। প্রাকৃত পিঙ্গল কাব্যে এক অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর খাওয়ার যে চিত্র এঁকেছেন, সেখানে আমরা দেখতে পাই কলাপাতায় ফেনাভাতে গাওয়া ঘি, গরম দুধ, ময়না মাছ, নালতে শাক (পাট) পরিবেশন করছেন স্ত্রী, এবং পুণ্যবান সেই সুখাদ্য গ্রহণ করছেন সানন্দে। মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যে বাঙালীর খাদ্যাভাষের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। যে অঞ্চলের প্রধান শষ্য ধান সেখানে ভাত উচ্চবর্ণের মানুষ থেকে স্বল্প বিত্ত সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের কাছেই পরম প্রিয় খাদ্য, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আজও বাঙালী সেই এক থালা ধূমায়িত ভাতের কাঙ্গাল; আটার রুটি খেতে বাধ্য হন মধুমেহ রোগের ফলে। 'আমাদের বাড়ি দুটো ডাল ভাত খেয়ে যাবেন' এ কথা আমাদের সকলের শোনা আছে, অথচ ভাতের সঙ্গে ডাল মেখে খাওয়ার প্রচলন প্রাচীন যুগে আদপেই ছিল না। মাছ, দুধ, নানাবিধ শাকসব্জি ছিল কিন্তু ডালকে আমাদের খাওয়ার অংশ করে নিতে মোঘল যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। পর্তুগিজদের হাত ধরে ভারত উপমহাদেশে এসেছে আলু, টমেটো, ফুলকপি। কিন্তু আমাদের নিত্য ব্যবহার্য কাঁচা লঙ্কা? দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কলম্বাসের হাত ধরে ইউরোপ ঘুরে লংকা ভারতে এসে পৌঁছোয় ১৫০০ শতকের শেষ দিকে। আগেকার দিনে ঝালের জন্য ব্যবহার হোত আদা ও গোল মরিচ। ধনে, জিরে, হলুদের ব্যবহার ছিল। মোঘল আমলে শুধু মশলা পেষার জন্য আলাদা মশলচি থাকত।

ভোজনের প্রয়োজন শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য হলে এতো বিবিধ কলা কৌশল রপ্ত করতে হতো না। খাওয়ার মধ্যে একটা ইন্দ্রীয়সুখের ব্যপার আছে, যেটা ভোজন রসিক মাত্রই জানেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'আমাকে পেটুক বলে যদি কল্পনা করো তাহলে ভুল করবে। আমি যতটা খাই তার চেয়ে গুণ গাই বেশী'। কবি নিজে রান্না করার নানা রকম নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন এবং পত্নী মৃণালিনী দেবীকে ফরমাস করে রান্না করাতেন। রান্নার বিবিধ পদ ও পাক প্রণালী নিয়ে আলোচনা করার আগে দেখা যাক বাঙালী হেঁশেলের বিবর্তন কিভাবে হয়েছে। আগেকার হিন্দু গৃহে জাতপাত, জলচল, আমিষ-নিরামিষ এসব

মানা হত, সেটা আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের চোখে দেখেছেন। রাঁধুনি বামুনের পইতে সদা সর্বদা দৃশ্যমান থাকত। রান্নার জায়গাটি তেল চিটে, দেওয়ালে হলুদের দাগ, ঝুল কালি সব অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হত এই সেদিন অবধি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও মাটির উনোনে রান্নার সরঞ্জাম ছিল ঘরে ঘরে । এরপর এল কেরোসিন স্টোভ এবং অবশেষে এল গ্যাস ওভেন। রান্নার সময় শ্রম সব সাশ্রয় হল।

নিরামিষ রান্নাঘর এক কালে বিধবা পিসীমা, ঠাকুমাদের এক চেটিয়া রাজপাট ছিল। তাদের ছোঁয়াচ বাচিয়ে চলা,

বারে বারে স্নান, বাসি কাপড় ছাড়া ইত্যাদি নিয়মের ঘেরাটোপে লুকানো থাকত ভারী নির্দয় এক বঞ্চনার ইতিহাস। বাল-বিধবারা আজীবন বঞ্চিত থাকতেন নূন্যতম পুষ্টি বর্ধক মাছ, মাংস এমন কি মুসুরির ডাল থেকেও। হয়ত এই কারণেই তাদের হাত থেকেই বাঙালী পেয়েছে এক অসাধারণ নিরামিষ রন্ধনসম্ভার, পেঁয়াজ ও রসুনের প্রবেশ ছিল না সেখানে। তরকারির খোসা দিয়ে চর্চড়ি, পেঁপের ডালনা, মুলোর ছেঁচকি, মোচার ঘণ্ট, লাউ ঘণ্ট, শুক্তোর মত অপূর্ব সব পদ যা বাংলার খাদ্য সম্ভারকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। এই সব মহিলাদের সমস্ত সময় কাটত রান্না ঘরে। নানারকম আচার, মোরব্বা, বড়ি, পাঁপড় তৈরি করতে এঁদের জুড়ি মেলা ভার। এক কালে অবশ্য পেঁয়াজ ও রসুন যবনের খাদ্য বলে বিবেচিত হত এবং হিন্দু বাড়ির হেঁসেলে এঁদের স্থান ছিল না। কালী পুজোর প্রসাদী মাংস আজও পেঁয়াজ রসুন বিনা রান্না হয় এবং গরমমশলা, নারকেল কোরা ও ঘি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হওয়ায় কোন খামতি টের পায় না কেউ।

ঝালে ঝোলে অম্বলে বাঙালী একথাটা বহু কাল ধরেই প্রচলিত। ঝোল সহ ব্যঞ্জন খাওয়ার কথা আমরা প্রথম পাই মধ্য যুগের কাব্যে। কবি নারায়ণ দেব লিখেছেন, 'ভাজিয়া তুলিলো চিথলের কোল, মাগুর মৎস্য রান্ধে মরিচের ঝোল'। আমিষ নিরামিষ সব ব্যঞ্জনেই ঝোল রান্নার প্রবণতা আছে বাঙালীর, তা সে মাছই হোক কি আলু পটল। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালীর ডাল রান্নায় জলীয় ভাগ বেশী। কুটনো কোটা বা মশলা বাটা সেখানেও আমরা অন্যান্য প্রদেশ থেকে আলাদা। দক্ষিণ ভারতে ও বাংলা ছাড়া শিল নোড়ার ব্যবহার কোথাও নেই বললেই চলে। আরেকটি বিশেষত্ব হল সব্জি বা মাছ কাটায় বঁটির ব্যবহার। ডান পা দিয়ে চেপে ধরে ধারালো ফলায় সব্জী রেখে গল্প করতে করতে অনায়াসে কুটনো কুটতেন আমাদের মা কাকীমারা। কোনও সব্জি ডুমো ডুমো, আবার ভাজা করতে হলে হলে পাতলা ঝিরিঝিরি অথবা চাকা চাকা নানা ভাবে কেটে ফেলতেন সহজেই। তবে আঁশ বঁটি হত আরো ধারালো, এবং এই একটি মাত্র অস্ত্রে মাছের আঁশ ছাড়ানো পেটি গাদা আলাদা করা সবই করা চলতো। শিল নোড়া ছাড়া মশলা বিশেষত সর্ষে অথবা পোস্ত বাটা যায় একথা এই সেদিন পর্যন্ত কেউ মানতে চাইতো না। একটু করে জলের ছিটে দিয়ে অল্প করে গোটা মশলা টেনে নিয়ে নোড়া দিয়ে তাকে মোলায়েম থকথকে রূপ দেওয়া শিলপাটা ব্যবহারের একটা নৈপুণ্য । এই সব কলা কৌশল আজকের ছিমছাম মডুলার কিচেনে ব্লেনডার ও ফুড প্রসেসরের দাপটে হয়ত অচিরেই হারিয়ে যাবে। সর্ষে বাটা দিয়ে ভাপা ইলিশ, ঝিঙ্গে পোস্ত, কাল জিরে এবং

কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মাছের ঝোল সুদুর প্রবাসেও এক মুহূর্তে আমাদের দিশি রসনাকে যে তৃপ্তি এনে দেয় তার কাছে কোথায় লাগে পাস্তা, ম্যকারনি, পিজা কি টিক্কা মশালা!

ছেলে বেলায় ভুল করেও সরস্বতী পূজোর আগে কেউ কুল খেতাম না পাছে বিদ্যার দেবী রুষ্ট হন। আবার বীণাপাণি বন্দনা ও পুষ্পাঞ্জলি শেষ হলেই সেই প্রসাদে কুল খাওয়ার আনন্দ ছিল অনাবিল। তিলের নাড়ু হত এই সময়ে। পশ্চিমবঙ্গে নিরামিষ মেনু হলেও এই দিন পূর্ববঙ্গীয়দের জোড়া ইলিশ খাওয়া চাই। পরের দিন হলো শীতলষষ্ঠী। আগের দিন জোগাড় করা চাই গোটা বেগুন, গোটা সিম, শীষযুক্ত পালংশাক, বোঁটাযুক্ত লম্বা বেগুন, এবং আরো কিছু সব্জী যা হাঁড়িতে সিদ্ধ হবে গোটা অবস্থায়। এই ঠান্ডা খাবারের স্বাদ কিন্তু রোজকার মশলাদার খাবার খাওয়া রসনায় ভারী আরামদায়ক। এরপর আসছে জামাই ষষ্ঠী। সেদিন মাছের বাজারে আগুন, তবু কন্যার পিতা জোগাড়ে বেরিয়ে পড়েন সকাল সকাল। ওইদিন শাশুড়ি মাতা তার জানা সব রকম রান্নাই উজাড় করে দেন জামাতা বাবাজির পাতে। সুগন্ধি পায়েস, মিষ্টি দই সব কিছুর মধ্যেই জড়িয়ে থাকে বিবাহিতা কন্যার ও জামাতার দীর্ঘায়ু কামনা।

কলার ভেলায় লখিন্দরের শব কোলে বেহুলার কাহিনী সবাই জানেন। নদী নালা, খাল বিলের দেশে আজও সাপের সঙ্গে বাস করেন বহু পল্লী গ্রামের মানুষ। নাগ জগতের দেবী মনসাকে উপেক্ষা করা চলে না। পশ্চিম বঙ্গে বেশ কিছু এলাকায় ভাদ্র মাসে একটি রান্না পূজো উৎসব হয়। আগের রাতে অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকারে বাড়ির সবাইকে জড় করে সারা রাত মুখে কাপড় বেঁধে, শুদ্ধ ভাবে নূতন পাত্রে রান্না হয়। এর মধ্যে মাছের পদ থাকে বেশী। এছাড়া থাকে পাঁচ রকম ভাজা, নারকেল কুরো ভাজা, ছোলা নারকেল দিয়ে কালো কচুর শাক, গুড় দিয়ে চালতার চাটনি ও সবশেষে হাঁড়িতে বসানো হয় ভাত। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে এক পদ, এছাড়াও অন্য মাছ থাকা আবশ্যক। রান্নাঘরের জঞ্জাল সাফ করে আলপনা এঁকে উনোনের মুখে শালুক ফুল ও ফণি মনসার ডাল সাজানো হয়। সিঁদুর মাখানো মা মনসার ঘটের সামনে ভোগ দিয়ে তারপরেই খাওয়া। পরের দিনকে বলা হয় পান্না। এইদিন পাড়া প্রতিবেশী কে নিমন্ত্রণ করে পান্তা খাওয়ানো হয়। এই একটি দিন রান্নার বিরতি কিন্তু

সেকালের এক ঘেয়ে রাঁধার পর খাওয়া ফের রাঁধার এক চাকাতেই বাধা জীবনের একটি ছুটির দিন বলা যায়।

শ্রাবণের ‘বরিষন মুখরিত রাত্রি’ হলেই বাঙালীর খিচুড়ি প্রেম জাগে। সঙ্গত করবে বেগুনী ও মাছ ভাজা কিংবা ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে বড়া। ভাদ্র মাসের কথা উঠলে তালের কথা উঠবেই। জন্মাষ্টমীতে গোপালকে দেওয়া হয় তালের ক্ষীর। নূতন ঝুড়িতে ঘষে তালের রস বার করে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে তালের বড়া, পিঠে ইত্যাদি করা হয়। ঘরে তৈরি আরেকটি মিষ্টি হল নাড়ু যা নারকেল কোরা গুড় বা চিনি দিয়ে সমস্ত শুভ কাজে বানানো হয়। এই নারকেলের সঙ্গে গুড়, তিল ও ভাজা চালের গুড়ি দিলে করা যায় আনন্দ নাড়ু। এছাড়াও নানা রকম তক্তি নারকেল বা ক্ষীর দিয়ে বানানো হত। নবীন চন্দ্র দাসের রসগোল্লার গল্প এখন সাম্প্রতিক একটি সিনেমার কল্যাণে সবাই জেনে গেছি। পর্তুগিজদের হাত ধরে ছানা এল বাংলায়, তারপর থেকেই চলে আসছে বাংলার সন্দেশ, পান্তুয়া, ও চমচমের জয়যাত্রা। বর্ধমানের সীতাভোগ ও রানাঘাটের ল্যাংচা না খেলে বাঙালীর জন্ম বৃথা। সকালের

জলখাবারে কচুরি ও জিলিপি এখন ও চালু আছে কলকাতা ও শহরতলীতে। দুর্গা পুজোর চার দিন ভুরি ভোজের পর পূর্ণিমাতে কোজাগরী আসার অপেক্ষা। পুজোর ভোগ মানেই ভাজা মুগের ভুনা খিচুড়ি আর লাবড়া। সেই গন্ধের কাছে কোথায় লাগে বিরিয়ানি বা তন্দুরি মুর্গি !

ফরাসী খাদ্যরসিক যেমন এক একটি কোর্স তরিবৎ করে খান ঠিক তেমন ভাবেই বাঙালী ভোজন রসিক জানেন রান্নার পদ সব একসঙ্গে পাতে না ঢেলে একটু একটু করে ভাতের চূড়ো ভেঙ্গে কি করে খেতে হয়। সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক ছবিতে মামাবাবুর খাওয়ার শুরুতেই সেই গহনা বড়ির কথা ভাবুন! সামান্য বড়িতেও কি অসাধারণ নান্দ্যনিকতা। প্রথমপাতে তেতো শুক্তো, তারপর ডাল ও ভাজা পেরিয়ে মাছ মাংস এবং শেষপাতে চাটনি ও দই মিষ্টি। পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজদের হাত ধরে আমাদের খাদ্য তালিকায় একে একে যুক্ত হয়েছে চপ , কাটলেট, ফাউলকারী, ফিসওরলি, কেকপেস্ট্রি ,কাস্টারড ও পুডিং। চিনা পল্লীর চাউমিন বা চিলি চিকেন এখন ঘরে ঘরে। বাঙ্গালীর আলুপ্রীতি বিরিয়ানী কেও রেহাই দেয়নি। তবুও বলবো, আজকের এই ফাস্ট ফুড কালচারের চাউমিন, বার্গার, পিজা জাতীয় চট জলদী খাবারের যুগেও বাঙালী ঝোলে ঝালে অম্বলে জড়িয়ে আছে, পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি সাবেকী রসনার ঐতিহ্যকে। কবির ভাষায় আমস্বত্ব দুধে না ফেললেও মাছে ভাতে বাঙ্গালীর সেই হাপুশ হাপুশ ঝোল ভাত খাওয়াটা টিকে গেছে ।

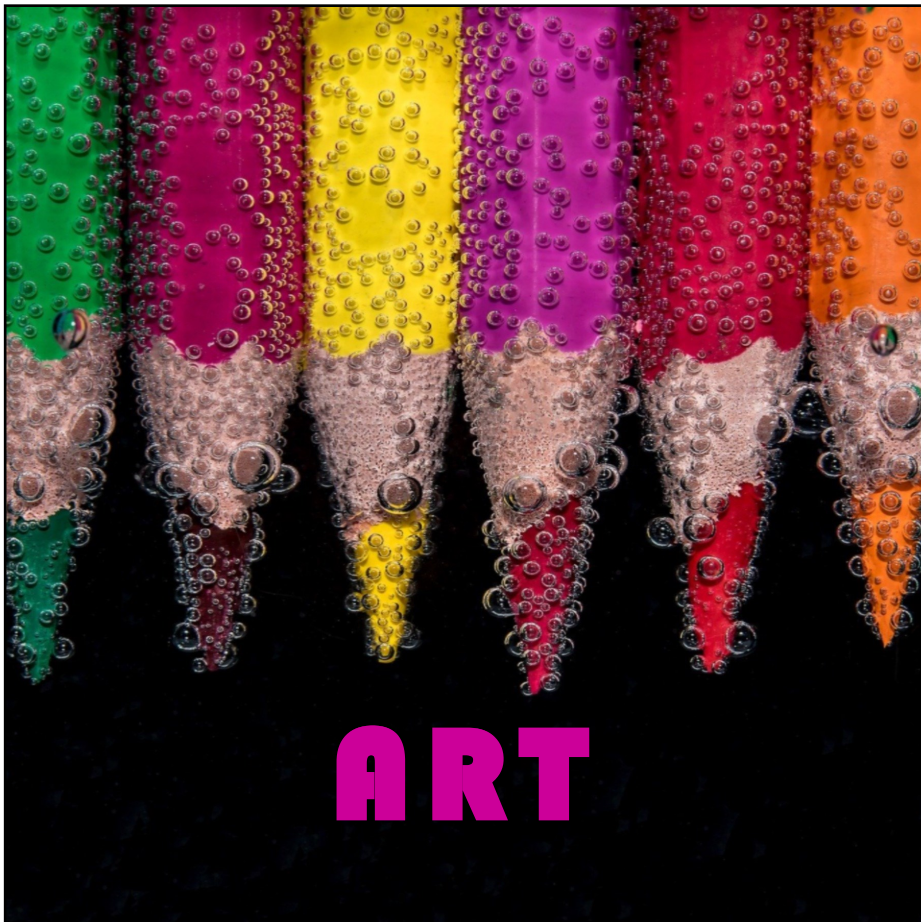
ART

&

PHOTOGRAPHY

Art and Photography

https://youtu.be/4wqCkbDQG1c

Background score: Snehesh Nag

Multi Media

https://youtu.be/lRQKI1QNvqo

Interview with **Dr. Sushovan Banerjee**

Interview taken by **Pratichi Editorial Board, 2020**

Dr. Banerjee is the recipient of Padma shri award in 2020, and his name has been included in the Guinness Book of World Records in July 2020, for his contribution to the medical field. He is known as *Ek Takar Daktar* (one-rupee doctor) for treating patients for the past 50 years in Bolpur Santiniketan area.

https://youtu.be/9ASPdHD2lEk

Pratichi editors organized an online adda session with celebrated guests from Kolkata on Sunday, September 27th. The esteemed guests include Kaushik Sen (Theater), Anirban Bhattacharjee (Film), Anindyo Chatterjee (Singer), Mir Afsar (Radio, TV Personality and Anchor), Indrani Dutta (Dancer), Indrayudh Majumdar (Sarod Player) and Rupa Majumdar (Director of Deb Sahitya Kutir, representing Literary World).

The topics of discussion was: ***How the personalities in arts and performing arts adapting to the virtual platforms and anticipated changes in the post pandemic world.***

https://youtu.be/QkPN08vri4I

Documentary: **Pompeii Lakshmi - Link between Ancient India, Greece, and Rome**
Produced by: **Rabi Chakraborty & Shoma Chakraborty**
Duration: **10 mins.**

Pompeii Lakshmi, the Indian artifact buried over 2000 years under the volcanic ash of Mt. Vesuvius, unearthed in Italy, proves strong ties between the great ancient powers of the World: Greece, Rome, Egypt, and India during the Hellenistic era.

BAGA EXECUTIVE COMMITTEES (PREVIOUS YEARS)

Year	President	Vice Presidents	Secretary/Jt. Secretaries	Treasurer
2019	Subho Nath	Dipanjan Banerjee Kamalaksha Das Moitri D. Sarker Paromita Ghosh Sukla Mondal		Biplab Chandra
2018	Ayan Banerjee	Subhadra Gupta Rajdeep Mondal Mohua Maity		Anirban Majumder
2017	Jay Bhattacharjee	Lahari Das Soma Dey Subhadra Gupta Kishore Chakraborty Mamata Paul		Chaitali Nath
2016	Parimal Majumder	Arindam Tapaswi Ayan Banerjee Kishore Chakraborty		Manas Chatterjee
2015	Munmun Sen	Mala Basu Parimal Majumder Arup Dhar	Anshuman Guin	Dipankar Roy
2014	Sonjukta Halder	Mousumi Karanjee Mausumi Basu	Reshmi Mukherjee	Sudipta Ray
2013	Monamee Adhikari / Sumit Dutta	Partho Banerjee		Sudip Kundu
2012	Abir Guha Thakurta	Avro Deb Shankar Sengupta	Ashoke Sarker	Subroto Majumdar
2011	Joy Bhattacharjee	Dharmajyoti Bhaumik Krishnendu Das	Monamee Ghosal	Bhaskar Mitra
2010	Achintya Dey	Ashima Das Sumit Dutta	Kaushik Basu	Debatirtha Basu
2009	Priyabrata Dutta	Debasree Chatterjee-Dawn Saswati Banerjee	Joyita Bagchi Hedge	Subhankar Mukherjee

BAGA EXECUTIVE COMMITTEES (PREVIOUS YEARS)

Year	President	Vice Presidents	Secretary/Jt. Secretaries	Treasurer
2008	Rabindra Chakraborty	Papiya Dutta	Mousumi Karanjee	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De	Shanta Gupta	Ranjita Betarbet	Umasankar Mondal
2006	Kiriti Gupta	Abir Mullick Anil Chakraberty	Dibyendu Dey	
2005	Mamata Paul	Sabari Roy	Premananda Goswami	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee (Jr.)	Mamata Paul	Maitree Sarkar	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta	Amalendu Sarkar	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha Surajit Roy
2002	Raktim Sen	Soumitra Chattopadhyay	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri	Mridul Kumar Paul	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya (partial term served)		Working Committee : Sumitra Bhattacharya Shubhra Nag Raja Gautam Kar	Timir Pandit
1999	Nita Bose	Shubhra Nag Maya Biswas	Ashoke Sarkar Madhumita Chatterjee Chaitali Chatterjee Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy	Sanjukta Haldar	Lekha Mukherjee Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee		Rajashree Jena Saibal Ghosal Gouri Banerjee	Timir Pandit
1996	Ashoke Bhattacharya		Sanjoy Maity	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty			Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee		Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri		Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag		Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu		Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya		Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi		Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar		Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas		Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi

BAGA EXECUTIVE COMMITTEES (PREVIOUS YEARS)

Year	President	Vice Presidents	Secretary/Jt. Secretaries	Treasurer
1986	Ashim Dutta		Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta		Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee		Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra		Niranjan Talukdar	Samir Mitra Lali Derrick
1982	Sabyasachi Gupta	Alak Biswas	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das		Samarendra Mitra	Partha Mukherjee Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen	Sumitra Bhattacharya	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya		Partha Mukherjee	

BAGA Financials

		BENGALI	Association	Of	Greater	Atlanta
		BALANCE	SHEET	As	Of	9/30/2020
		As of 12/31/2019	As of 3/31/2020	As of 6/30/2020	As of 9/30/2020	
CD	~~WELLSFARGO 099~~	10,000	10,000	10,000	10,000	
CD	WELLS FARGO 281	15,231.57	15,231.57	15,231.57	15,231.57	
CD	WELLS FARGO 224	32,158.72	32,158.72	32,158.72	32,158.72	
CD	PIEDMONT BANK	30,000	30,000	30,000	30,000	
MM	SAVINGS WELLSFARGO	2,584.09	2,584.27	2,584.34	2,584.40	
BOD	CHECKING ACCOUNTS	3,147.19	13,540.22	11,267.22	8,493.13	
	Interest earned on fixed deposit	1,069.97	1,069.97	1,069.97	1,069.97	
	Total Asset Of BOD	94,191.63	104,584.75	102,311.82	99,537.79	
	BSC Checking Account	4,147.15	3,308.86	3,108.86	3,108.86	
	EC Checking Account	10,303.28	29,967.07	27,041.76	30,428.35	
	BYC Cash in hand	1,113.07	0	0	0	
	Total BAGA ASSETS	109,755.06	137,860.68	132,462.44	$133,075.00	
	Liabilities & Equity					
	Total Liability					
	Equity					
	Opening Balance Equity	89,148.50	104,025.79	121,216.65	115,517.31	
	Retained Equity	14,171.10	14,171.10	14,171.10	14,171.10	
	Net income/ loss	6,436.46	19,663.79	-2925.31	3,386.59	
	Total Equity					

সমাপ্তি

সম্পাদকীয় বিশ বিশ (২০২০) সালটি মনে হয়েছিল অনেক কিছুর পরিবর্তন করে দেবে। সেই অনুযায়ী অনেক রকম আশা আকাঙ্ক্ষা মনে মনে দানা বাঁধছিল গত কয়েক বছর ধরেই। কিন্তু বাস্তবে হল উল্টোটা। পরিবর্তন এল, তবে তার তীরটা খারাপ দিকে মুখ করে। কাজেই কেউ যদি এই বছর টাকে বিষ বিষ বলেন তো তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যাবে না। এ দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে একাধিক হারিকেনের প্রভাব, পশ্চিম দিকে দাবানলের প্রভাবে কত যে ক্ষয়ক্ষতি হল তার হিসেব নেই, আরব সাগর থেকে শুরু হয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে ভারতে গিয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করল এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'আমপান,' সর্বোপরি এক অতিমারী 'করোনা' এসে জুটল যা সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে প্রভাবিত করেছে এবং এখনও তার বিদায় নেবার কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু মানুষকে বাঁচার জন্যে সমস্ত কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে যখন স্প্যানিশ ফ্লু বা প্লেগ হয়েছিল তখন মানুষ কি করে তার থেকে বেরিয়ে এসেছিল বা কি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করত জানিনা। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে যে এবারের অতিমারী আর যাই করুক, সবাইকে কিছুটা হলেও কারিগরী ভাবে দক্ষ করে তুলেছে, সে পাঁচ বছরের শিশুই হোক বা নব্বই বছরের বৃদ্ধই হোক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রথা ভেঙে এই বারই প্রথম 'প্রতীচি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে না, বরঞ্চ এটি এবারে বহুমুখী মাধ্যমে (multi media) আসছে আপনাদের সামনে (print, audio, এবং video)। সামাজিক দূরত্ব বিধি মানতে গিয়ে এবারের কমিটি কোন মুখোমুখি meeting করতে পারেনি, তার বদলে সমস্ত কিছুই করা হয়েছে Zoom meeting-এর মাধ্যমে। এ তো গেল আমাদের প্রকাশনার কথা। এবারের পুজোও হবে এক অভিনব ভাবে। এক স্থানে বসে পুরোহিত পুজো করবেন, আর দর্শকরা নিজ নিজ বাড়িতে বসে computer -এ দেখবেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে চাইলে তাও দিতে পারবেন। বিপদে পড়ে সকলকে কিছু নতুনত্ব আনতে হয়েছে ব্যবস্থায়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত:/অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহং/পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং/ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে।। অর্থাৎ কিনা যখনই অধর্ম বা কোন বিপর্যয় ভারতে আসবে, তখনই তিনি এসে তার থেকে জনগণকে রক্ষা করবেন। যদিও কথাটি ভারত সম্পর্কে বলা, এর তাৎপর্য বিশ্বজনীন।

এবারে তাঁর কাছে বর চাই তিনি এসে আমাদের উদ্ধার করুন এই অতিমারী সহ নানারকম বিপর্যয় থেকে, সঙ্গে থাকুক কল্যাণময়ী মায়ের আশীর্বাদ । আপনাদের পুজো ভাল কাটুক, আনন্দে কাটুক, প্রার্থনা করি যে আগামী বছরটা সপরিবারে সুস্থ থাকুন, আবার সবার জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসুক।

আশা করি আগামী দিনে আবার আমরা সশরীরে সপরিবারে সবাই মিলিত হতে পারব যখন 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' আসবে।

কল্যাণমস্তু।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

BAGA 2020 Pratichi Editorial Board

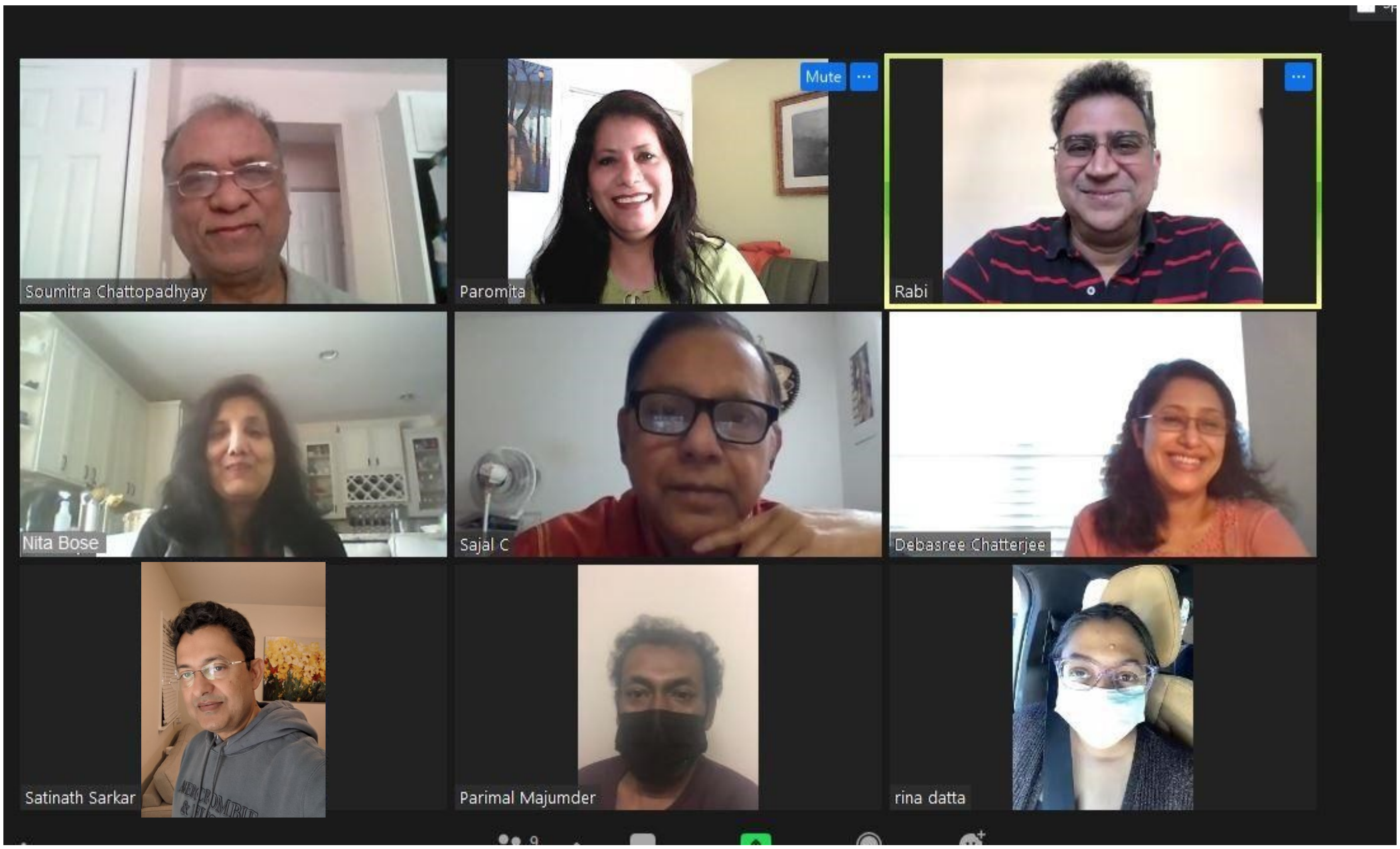

Best wishes from the BAGA Pratichi 2020 Editorial Board. Hope you have enjoyed this year's unique *Pratichi-The West* magazine.

Wish everyone a safe and healthy Sharodiya Durga Pujo!